আনাতোলি তমিলিন
পৃথিবী কি গোল?

আনাতোলি
তমিলিন
পৃথিবী
কি
গোল?
ছবি এঁকেছেন ইউরি স্‌মোল্‌নিকভ
অনুবাদ: অরুণ সোম
'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

গোড়ার কথা

পৃথিবীর আকার কেমন? প্রশ্নটা অদ্ভুত বলে মনে হয়, তাই না? পৃথিবীকে ভূগোলক বলা হয়। গোলক মানে গোল। পৃথিবী গোল ছাড়া আর কেমন হবে?

পৃথিবী যে গোলাকার বিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমার আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক আকাশের নীল রঙ, গাছপালার সবুজ রঙ। তার কারণ এই যে ছেলেবেলা থেকেই আমাদের শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে যে পৃথিবীটা গোল। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই স্পষ্ট যে প্রমাণের কোন দরকার হয় না?

চলে এসো কোন মাঠে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসো অনেক অনেক দূরে, মাঠের মধ্যিখানে, যাতে দূর দিগন্তের দিকে তাকালে রঙচঙে পাপড়ির ফুল আর ঘাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখ। কী দেখতে পাচ্ছ? — পৃথিবীর ওপরটা কি বাঁকা, ফোলা?.. না ত। সেরকম কিছুই চোখে পড়ছে না। এই ত চোখের সামনে দিব্যি দেখা যাচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো পৃথিবী। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ওপরকার প্রতিটি ঢিবি, প্রতিটি ঝোপঝাড়। তাহলে কে বলল পৃথিবীটা গোল?

কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার যন্ত্রে যখন ভূপৃষ্ঠের পরিধি মাপা হল তখন দেখা গেল আমাদের গ্রহের আকার আসলে জটিল — অনেকটা নাশপাতির মতো। সুমেরুর কাছাকাছি উত্তর গোলার্ধ খানিকটা ওপর দিকে উঠে গেছে, আবার দক্ষিণ গোলার্ধ সামান্য দাবানো। পৃথিবীর গায়ে যেমন টোল আছে তেমনি আবার ফুলো ফুলো জায়গাও আছে। শুধু কি তাই? পৃথিবীকে যদি বিষুবরেখা বরাবর সমান দুটুকরো করে কাটা যায় তাহলেও দেখা যাবে ছেদের জায়গায় পুরোপুরি বৃত্ত না হয়ে কিছুটা যেন উঠে গেছে। সত্যিকারের নাশপাতি যাকে বলে, তাও আবার বেশ বাঁকাচোরা। কী নাম দেওয়া যায় এ ধরনের আকারকে?

বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামান। নানা রকম নাম বাছাবাছি করার পর শেষকালে তাঁরা যে নামটি রাখলেন তা হল 'geoid'। শব্দটা যৌগিক। গ্রীক ভাষায় 'geo' মানে ভূ, অর্থাৎ পৃথিবী আর গ্রীক ভাষারই শব্দ 'eidos', অর্থাৎ আকার —এই দুয়ের মিলনে এর উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দাঁড়াচ্ছে ভূসদৃশ। তাহলে ঘটনাটা এই যে আমাদের পৃথিবীটা গোলক হলেও পুরোপুরি তা নয়। মানুষ কী ভাবে পৃথিবীর আকার জানতে পারল সে ইতিহাস দীর্ঘ, অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। তাই নিয়েই আমাদের এই বই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এলাকাটাই আমার
পৃথিবী
আদি বাসস্থান ছাড়ার কারণ
মানুষ কী ভাবে একসঙ্গে
বসবাস করতে শিখল
প্রথম ভ্রমণ
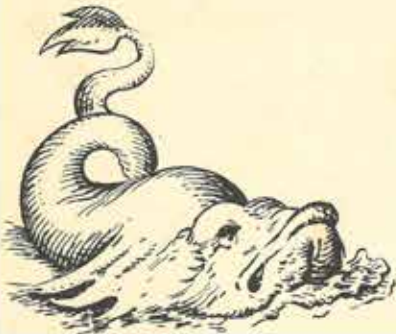
আমার এলাকাটাই আমার পৃথিবী

কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ বেশি ছিল না। মাঠ আর বনে বসবাসকারী অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষকে দুর্বল মনে হত। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার মতো অথবা নিজের খাবার জন্য বন্য পশুপাখি শিকার করার উপযুক্ত শক্ত নখর ও ধারাল দাঁত তার ছিল না। হিম থেকে গা বাঁচানোর জন্য সর্বাঙ্গে যেমন ঘন ও গরম লোম থাকা দরকার তাও তার ছিল না। ওড়ার ডানা তার ছিল না, দাবানল বা বসন্তের বন্যা থেকে পালানোর মতো পায়ের জোরও ছিল না। থাকার মধ্যে তার ছিল যৎসামান্য বুদ্ধিবিবেচনা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষমতা।

পৃথিবীর আদিম মানুষের জীবন ছিল কঠিন। কঠিন ছিল, ক্ষুধার তাড়না ছিল। সারাদিন ধরে নারী ও শিশুরা যোগাড় করত গাছের মূল-কন্দ আর শাকপাতা, পুরুষেরা কেউ কেউ চেষ্টা করত মাছ ধরতে, কেউ বা ছোট বড় যাই হোক কোন না কোন জন্তুজানোয়ার ধরতে। মানুষ তখন বাস করত বড় বড় পারিবারিক দল বেঁধে — বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, খুড়ো-জ্যাঠা, পিসি, ভাইপো, ভাইঝি — সবাই সবার আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠী। সন্ধ্যা হতে না হতে সকলে এটা সেটা খাবারদাবার নিয়ে তাদের বাসস্থান গুহায় এসে জড় হয়। সেখানে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গোল হয়ে বসে ভাগা-ভাগি করে খাবার খায়।

আদিম মানুষ দীর্ঘকাল কেবল পাথর কাঠ আর হাড় দিয়েই শ্রম ও শিকারের হাতিয়ার বানাতে পারত। পাথরের কুড়ুল বা ছুরি তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়। হাতিয়ারের উপযুক্ত একটা পাথরের খণ্ড খুঁজে বার করতে কত সময়ই না নষ্ট হয়! পাথরের খোঁজে নিজেদের এলাকা থেকে দূরে যেতে হত। অবশ্য এটাও ঠিক যে বড্ড বেশি দূরে তারা যেত না, তাতে পথ হারানোর আশঙ্কা থাকত। যেতে যেতে লোকে গিয়ে পড়ত গিরিখাতের ভেতরে, যেখানে ভেঙে-পড়া শিলাখণ্ডগুলি পাহাড়ী নদীর প্রবল স্রোতে গড়াতে গড়াতে গোল গোল নুড়ির আকার পেত। কখনও বা তারা সাগরতীরে, শৈলসঙ্কুল বেলাভূমিতে উপযুক্ত পাথর খুঁজে বেড়াত।

আদিম মানুষেরা সময় সময় ঐ সমস্ত পাথরের মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু কিছু পাথরের সন্ধান পেত। সেই পাথর পিটিয়ে চ্যাপ্‌টা করা যেত, পিটালে ফাটত না, টুকরো টুকরো হয়ে যেত না। দুটো বড় বড় পাথরের মাঝখানে ফেলে অনেকক্ষণ ঘা মারতে পারলে অনেক সময় ছুরির জন্য পাতলা পাত কিংবা কুড়ুলের জন্য খানিকটা স্থূল ধরনের কুঁদো হত। এই হাতিয়ারগুলোকে শান দেওয়া যেত।

তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ যে ওগুলো আসলে স্বাভাবিক ধাতুপিণ্ড: তামা, সোনা, কখনও কখনও আবার রুপোও পাওয়া যেত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দর পর সহস্রাব্দ কেটে গেল। ধীরমন্থর গতিতে বদলাতে লাগল আদিম মানুষের জীবনযাত্রা। বিন্দু বিন্দু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে চলল। পৃথিবী যে কত বড় হতে পারে সেই সময় এ নিয়ে কোন মানুষই মাথা ঘামাত না। চারপাশের সবকিছুই বড় বলে মনে হত। নদী, সরোবর — মনে হত বিশাল বিশাল। তার আরও কারণ এই যে আদিম মানুষের তখনও নৌকো ছিল না। তৃণভূমি, বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত — তার পক্ষে পার হওয়া দুঃসাধ্য। লোকে যানবাহন বলতে কিছু জানত না। একে শুধু দু'পায়ের ওপর ভরসা, তায় আবার পথঘাটের বালাই নেই — কত দূরই বা যাওয়া যেতে পারে? ভয়াবহ! বনেজঙ্গলে আর তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত রাজ্যের রক্তপিপাসু জন্তুজানোয়ার। সরোবরে, সাগর-মহাসাগরে আছে হিংস্র মাছেরা। সকলেই অসতর্ক পথিককে গিলে খাওয়ার তালে আছে। গিলে যদি নাও খায় ভয় ত পাইয়েই দেবে। লোকে তাই চেষ্টা করত বেশি দূরে না গিয়ে নিজের নিজের এলাকার কাছেপিঠে থাকার। তখন পর্যন্ত দূর যাত্রার কথা কেউ চিন্তাই করত না। আর এই কারণেই আদিম মানুষের কাছে তার আস্তানা আর আশেপাশে চোখে যতটুকু দেখা যেত সেটাই ছিল গোটা পৃথিবী।

আদি বাসস্থান ছাড়ার কারণ

বিজ্ঞানীদের মতে, সবচেয়ে আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অঞ্চলগুলিতে। ঐ সব এলাকাতেই আদিম মানুষের প্রাচীনতম দেহাবশেষ ও তার স্থূল হাতিয়ার পাওয়া গেছে, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে বা অস্ট্রেলিয়ায় এমন কোন নিদর্শন মেলে নি। তার মানে কি এই নয় যে মানুষ আরও পরে কোন এক সময় সেখানে বাসাবদল করে? বাসাবদল কেন করে? কেন চলে যায় নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে? কী ভাবেই বা পার হয় সুবিশাল মহাসাগর?

জানা গেছে যে এ ধরনের বাসাবদলের কারণ অনেক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুধার তাড়না। আদিম শিকারীরা বন্য জন্তুজানোয়ারের পালের পেছন পেছন বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যেত: বন্য জন্তুজানোয়ার যেখানে, তারাও সেখানে যেত। কোন কোন কুলকে বাড়াবাড়ি রকমের জঙ্গী পড়শীদের হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হত। আবার কোন কোন সময় পৃথিবী নিজেও জীবজন্তু ও মানুষের বাসভূমি ত্যাগের কারণ হত।

আমাদের এই গ্রহের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন বেশ কয়েকটি পর্বের সন্ধান পেয়েছেন যখন উষ্ণ জলবায়ুর বদলে এসেছে শৈত্য, তারপর আবার উষ্ণতা। কেন যে এমন ঘটেছিল বলা কঠিন। এটা ঘটে বিশেষ করে তখনই যখন ভূগর্ভের ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি জেগে ওঠে। মারাত্মক মারাত্মক ভূমিকম্পে পৃথিবীর মাটি টলমল করে। পৃথিবীর গায়ে ভাঁজ পড়তে থাকে। জেগে ওঠে নতুন নতুন পাহাড়পর্বত, ধূমোয়মান আগ্নেয়গিরি, আর পৃথিবী চৌচির হয়ে বেরোতে থাকে যত রকমের গভীর ফাটল — গিরিখাত। জাগ্রত আগ্নেয়গিরিগুলি বায়ুমণ্ডলে এত বেশি পরিমাণ ছাই ছুঁড়ে ফেলতে থাকে যে বাতাস আর স্বচ্ছ রইল না। ঘন ভারী কালো কালো মেঘের দল সূর্যকে বহু কালের জন্য ঢেকে রেখে দেয়। ঠাণ্ডা নেমে আসে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য এমন কথাও বলেন যে

সময় সময় সূর্য নিজেই আর তেমন উজ্জ্বল কিরণ দিত না, আমাদের পৃথিবীতে কম তাপ দিত। কারণ যাই হোক না কেন, ঠিক এই ধরনের পর্বগুলিতেই পৃথিবীর উঁচু উঁচু জায়গায় হিমবাহ গড়ে উঠতে লাগল। সাগর-মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ওপরে উঠে গিয়ে তুষার হয়ে ঝরে পড়ে শ্যামল উপত্যকাভূমিগুলিকে ঘন তুষারস্তূপে ঢেকে দিল। পাহাড়ের হিমবাহ পুরু আর ভারী হতে থাকে, এদিকে সাগরের জল ক্রমেই কমতে থাকে। সাগরের কোন কোন অগভীর অংশে তলা পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল, পরে সেগুলি শুকিয়ে গিয়ে ডাঙা হল। পৃথিবীর এক অংশ থেকে অন্য অংশের ওপর গড়ে উঠল ডাঙার সেতু। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে কি পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে ভয়ঙ্কর শৈত্যপ্রবাহ চলেছিল মানুষের আবির্ভাবের বহুকাল আগে। তবে মানুষও তার কবল থেকে একেবারে রেহাই পায় নি।

হিমবাহগুলি তাদের নিজেদের ভারে পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমভূমিতে গড়িয়ে নামতে থাকে। ঠান্ডার তাড়নায় তৃণভোজী পশুপাল পালাতে থাকে, তাদের পেছন পেছন হিংস্র জন্তুজানোয়ার। সেই সঙ্গে মানুষও।

ডাঙার সেতু বয়ে দলে দলে জীবজন্তু এবং সেই সঙ্গে আদিম শিকারীরাও এশিয়া থেকে আমেরিকা মহাদেশে চলে আসতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ-চীন সাগরের খালি তলদেশ আর সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার কোন বাধাই ছিল না।

হাজার হাজার বছর ধরে চলল হিমযুগ। কিন্তু হাজার হাজার বছরও ত আর অনন্তকাল নয়! ধীরে ধীরে ভারী মেঘ সরে যেতে লাগল, সূর্য ফের উজ্জ্বল কিরণ দিতে শুরু করল। ফলে বরফ গলল, হিমবাহ সরে যেতে বাধ্য হল। বরফমুক্ত জমিগুলিতে আবার গজিয়ে উঠল রসাল শ্যামল ঘাস, মাথা তুলে দাঁড়াল কচি গাছপালার বন। ঘন তৃণভূমিতে আগমন ঘটল ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, বড় বড় শিঙওয়ালা হরিণ, ঘোড়া, কস্তুরীগাই — এই রকম বিশাল বিশাল জন্তুর। তাদের অনুসরণ করে শিকারীরাও ফের জায়গা বদল করল।

এদিকে সূর্য আরও প্রখর হয়ে উঠল, দাবদাহ ছড়াতে লাগল। উত্তাল নদনদী সাগরে গিয়ে পড়তে লাগল। জল উঠে বন্যায় ভাসিয়ে দিল ডাঙার সেতু। যে সমস্ত মানুষ পেছনে পড়ে ছিল তারা চিরকালের জন্য অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

এই ধরনের হিমযুগ আর উষ্ণতার যুগ একাধিকবার আসে। প্রতিবারই ঠান্ডায় ও ক্ষুধার তাড়নায়, উষ্ণতার আশায় জীবজন্তু ও মানুষেরা উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে ও দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তরে সরে যায়। সর্বত্রই গতি আর গতি — পশুপাখি, মানুষ সকলেই বাসবদল করে চলছে। অনেকেই এই স্থানান্তরের ধকল সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। তবে অনেকে বেঁচেও থাকে। আর প্রতিবারই এরকম বাসবদলের ফলে মানুষের জীবনে কিছু না কিছু নূতনত্ব আসে।
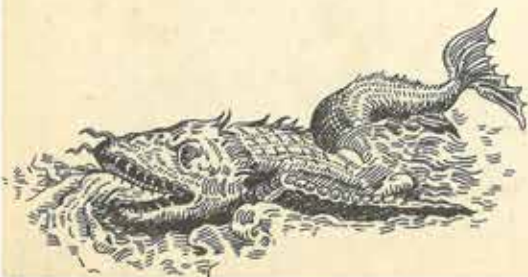
শিকার একটা ভালো জীবিকা, তবে তার ওপর খুব একটা নির্ভর করা যায় না। আজ হয়ত একপাল হরিণ ধরা পড়ল, পরদিন — কিছুই না। অথচ খেতে ত হয় রোজই। তাহলে শিকারীর শ্রম কী ভাবে সহজসাধ্য করা যায়?

কোন এক সময় কেউ কুকুর পোষ মানাল। হয়ত সে কুকুর প্রথমে অসুস্থ বা আহত ছিল, মানুষ করুণাপরবশ হয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল, পেট পুরে তাকে খাওয়াল। কুকুর নিয়ে শিকার করা অনেক সুবিধার হল। কুকুর শিকার খুঁজে বার করে। মানুষ পশু শিকার করে। মাংস ও ছাল নিজের জন্য রাখে, হাড় আর নাড়িভুঁড়ি দেয় তার চারপেয়ে সাহায্যকারীকে। কতই বা দরকার তার?

মানুষ অল্প অল্প করে অন্যান্য বন্য জন্তুকেও পোষ মানাতে লাগল। কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না, খুব তাড়াতাড়িও হল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ পেল গৃহপালিত পশু।

কন্দমূল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজও দেখতে দেখতে নারী ও শিশুদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বসতিতে খাওয়ার লোকজনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সকলের জন্য যোগাড় করা কি সম্ভব? নারীরা শেষকালে লক্ষ করল যে খাদ্যশস্যের বীজ যদি নদীর ধারের ভিজে পলিমাটিতে বোনা যায়, তাহলে বুনো মাঠের তুলনায় গাছ আরও বড় ও মজবুত হয়। ফসলের শীষ আরও বড় আকারের হয়, দানা আরও ভারী হয়। তাছাড়া সারা দিন ধরে একটা একটা করে শীষ খুঁজে খুঁজে দানা বার করার হাঙ্গামাও পোয়াতে হয় না। যেখানে বোনা হল সেখানেই ফসল ফলল। লোকে তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে ফসলের বীজ পাঁকে পুঁততে লাগল। এতে প্রথম লাভ হল এই যে ফসল আরও ভালো ফলে, দ্বিতীয়ত পাখিরা খুঁটে খেয়ে ফেলতে পারে না। এই ভাবে প্রথম খেতের আবির্ভাব। কৃষিকাজের সূত্রপাত।

পশুপালন ও কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বেশ সচ্ছল হয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে গৃহস্থালি জটিলও হয়ে পড়ল: একে শিকার, তার ওপর পশুপালন, ওদিকে আবার জমি চাষ করতে হয়, হাঁড়িকুঁড়ি বানাতে হয়, হাতিয়ারও তৈরি করতে হয়। একটা ছোট-খাটো পরিবারের পক্ষে সব দিক সামলানো মুশকিল। মানুষ ভাবতে শুরু করল, আচ্ছা, প্রতিবেশী কুলের সঙ্গে মিললে কেমন হয়?

আলাদা আলাদা কুল বা পরিবার এই ভাবে একসঙ্গে মিলে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে শুরু করল। বড় বড় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করা অনেক নিরাপদ, আবার খানিকটা কঠিনও বটে। এ ধরনের গৃহস্থালিতে কাজের বণ্টন কী ভাবে হবে? — কে কী কাজ করবে? শিকার আর লাভের বখরা কী ভাবে হবে? — কে বেশি পাবে, কেই বা কম?

ঠিক হল সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকদের নিয়ে গোষ্ঠীসভা তৈরি করা হবে। শিকার আর যুদ্ধের সময়ও পরিবারগুলি যূথবদ্ধ হত, সাময়িক বন্ধনে আবদ্ধ হত। কিন্তু কৃষিকর্মে দরকার হত স্থায়ী সহযোগিতার। নতুন খেতের জন্য জলাভূমি শুকোতে হলে, খাল কাটতে হলে অথবা বন্যা রোধের জন্য বাঁধ তৈরি করতে হলে সমবেত প্রয়াস অপরিহার্য।
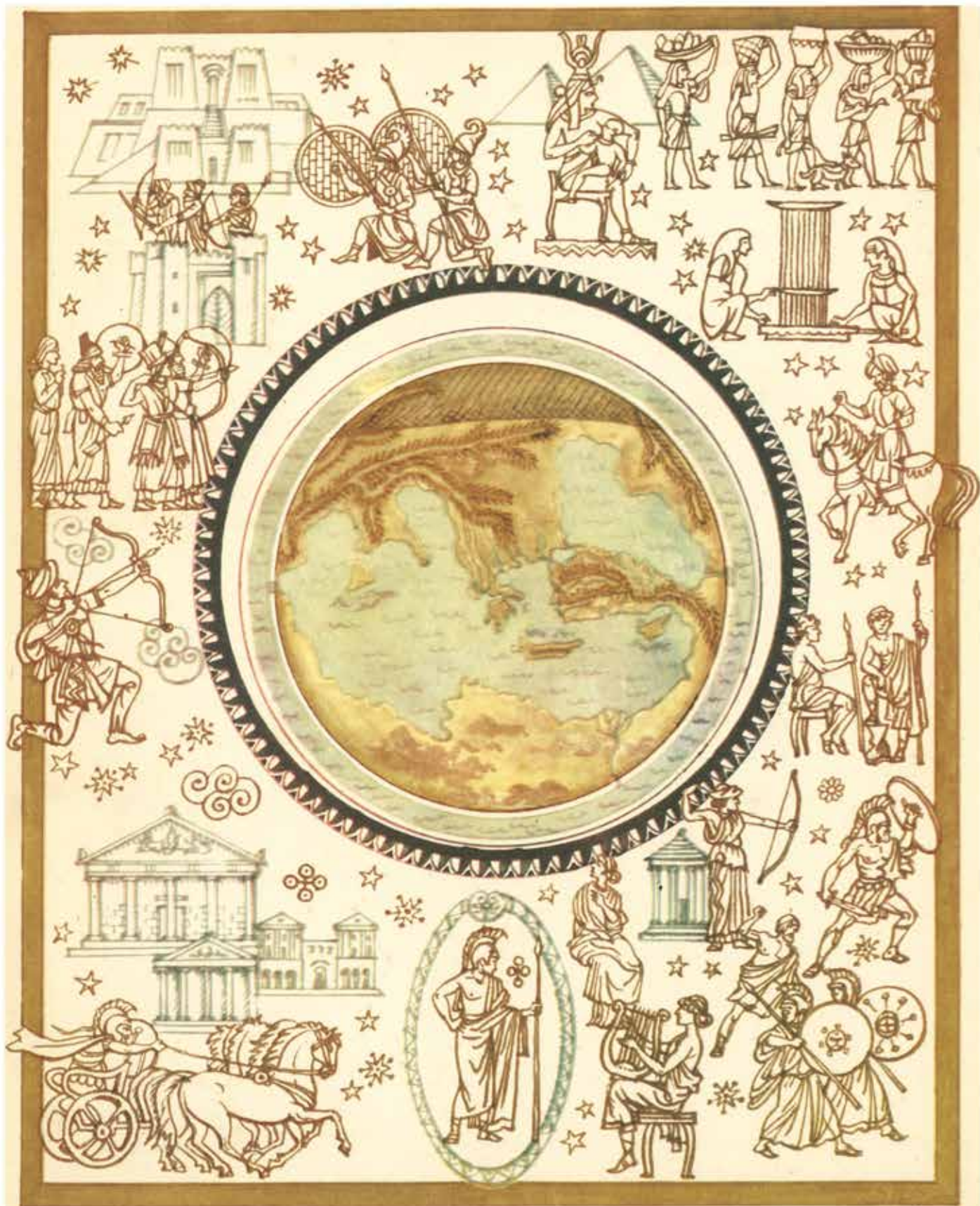
ইতিহাসবিদরা বলেন যে উন্নতমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির প্রথম আবির্ভাব ঘটে নদী অববাহিকায়। আগে কোথায়, বলা কঠিন। সম্ভবত মেসোপোটামিয়ার দক্ষিণ অংশে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটাস নদীবিধৌত নিম্নপ্রান্তরে। আবার এমনও হতে পারে যে ভারতের সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় কিংবা জলপূর্ণ নীল নদের অববাহিকায়। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে মানুষ আগে চাষবাস করতে, বীজ বুনতে, জমি জরিপ করতে এবং খাল কেটে জমিতে জলসেচের কাজ করতে শেখে। এই সমস্ত জায়গায়ই প্রথম খনি থেকে ধাতু তুলে গলানো হয়, উঁচু উঁচু ইমারত বানানো হয়।

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সমান অনুপাতে ভাগ করা নেই। যেমন ধর না কেন, কোন জনবসতিতে হয়ত অনেক খনি আছে, কিন্তু লবণ নেই। আবার অন্য জায়গায় তার উলটোটা। কোন পল্লীতে বা শহরে হয়ত অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরি হয়, আবার অন্যত্র হয় বাসনপত্র। তখন লোকে যার কাছে যে জিনিস উদ্বৃত্ত আছে তাই দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিনিময় শুরু করে দিল। পরস্পরের কাছে পণ্যদ্রব্য আনতে শুরু করল। বণিকদের আবির্ভাব ঘটল। জন্ম হল বাণিজ্যের। দেখা গেল বণিকজাতটা মাথায় বেশ বুদ্ধি রাখে। যারা জানা রাস্তাঘাট ছেড়ে অচেনা পথে যাত্রা করার ঝুঁকি নিতে পারে তারা যে প্রচুর লাভ করে ফিরে আসে এটা বুঝতে তাদের বাকি রইল না। এই ভাবে শুরু হল প্রথম বাণিজ্যযাত্রা। তখনই মানুষকে জানতে হল কোথায় কী রকম লোকজনের বাস, কী সম্পদ তাদের আছে, কী তাদের অভাব, তাদের জমিই বা কেমন।

পৃথিবীর প্রাচীন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় তীরভূমি। স্মরণাতীত কাল থেকে বহু জাতের অসংখ্য মানুষ এখানে এসে ভিড় করে।

পৃথিবীর অত্যুন্নত প্রাচীন সভ্যতাগুলির একটির — গ্রীক সংস্কৃতির উদ্ভব এখানেই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা

জ্ঞানবিজ্ঞানের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে যান। প্রথম মানচিত্র রচয়িতার মধ্যে তাঁরা ছিলেন অন্যতম। ঐ সমস্ত মানচিত্রে তাঁরা পৃথিবীর যে ছবি আঁকেন তাতে পৃথিবীটা দেখতে ছিল একটা বড় দ্বীপের মতো, তার মাঝখানে সমুদ্র। দ্বীপের চারপাশে বয়ে চলেছে আদি অন্তহীন মহাসাগরের উত্তাল প্রবাহ।

প্রাচীন গ্রীকেরা এরকম পৃথিবী-দ্বীপের নাম দিয়েছিলেন 'ওইকুমেনাস', যার অর্থ হল 'জন অধ্যুষিত ভূমি'।

এশিয়া, ভারত, চীন ও ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু ভূমধ্য-সাগরীয় 'জনভূমির' সঙ্গে সেগুলির ব্যবধান ছিল হাজার হাজার মাইলের পথ, পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমি। কিছু কিছু দুঃসাহসী লোকজন কারাভান সাজিয়ে অথবা নড়বড়ে জাহাজে চেপে পণ্যদ্রব্য নিয়ে দূর দূর দেশে যাত্রা করতে মনস্থ করল। যারা ওখানে থাকার পর ফিরে আসতে পারত তারা সাগরপারের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস ছাড়াও সঙ্গে করে আনত আজব দেশ আর বিস্ময়কর লোকজন সম্পর্কে অঢেল কাহিনী। ভ্রমণকারীরা সোনা আর মণিমাণিক্যের দেশ, সমৃদ্ধিশালী ভারতের কথা বলেন, অসংখ্য ঘোড়ার পাল আর মানুষের মাথার চেয়ে উঁচু ঘাসে ঢাকা সীমাহীন স্তেপ তৃণভূমির শকদের বর্ণনা দেন। আর মহার্ঘ ধাতু থেকে কী অপূর্ব অস্ত্রই না বানাতে জানত মধ্য এশিয়ার হূনরীরা! ব্রোঞ্জ গলানোর জন্য যে টিন পাথর এত অপরিহার্য তা কী প্রচুর পরিমাণেই না পাওয়া যায় দূর ব্রিটেনে!

সেই আমলের প্রতিটি ভ্রমণই ছিল এক একটি ঘটনা বিশেষ। দুঃসাহসী ভূপর্যটক-দের নাম ইতিহাসে থেকে যায়। তাঁদের সম্পর্কে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তাঁদের নিয়ে গান বাঁধা হয়। তাঁদের পর্যটনের খুঁটিনাটি বিবরণ বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। সাগরপারের দূর দূর দেশে অজানা লোকজনের কাছে যাত্রার কাহিনী শোনার চেয়ে আর কিছুতেই মানুষ বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত না। হয়ত ঠিক এই সময়ই শ্রোতাদের মনে কিংবা কথকদের নিজেদের মনেই বুঝিবা প্রশ্ন জাগে: 'আমাদের এই পৃথিবীটা কেমন? কিসের মতো? তার শেষই বা কোথায়? কী আছে তার শেষে?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবী কি চেপ্টা?
জ্ঞানসাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান
ফিনিশীয়দের ধারণা
পৃথিবী গোল — এই ধারণা প্রথম কাদের?
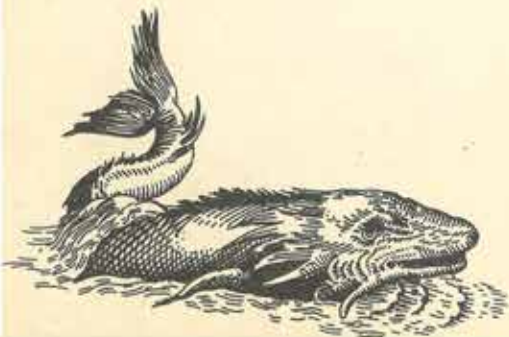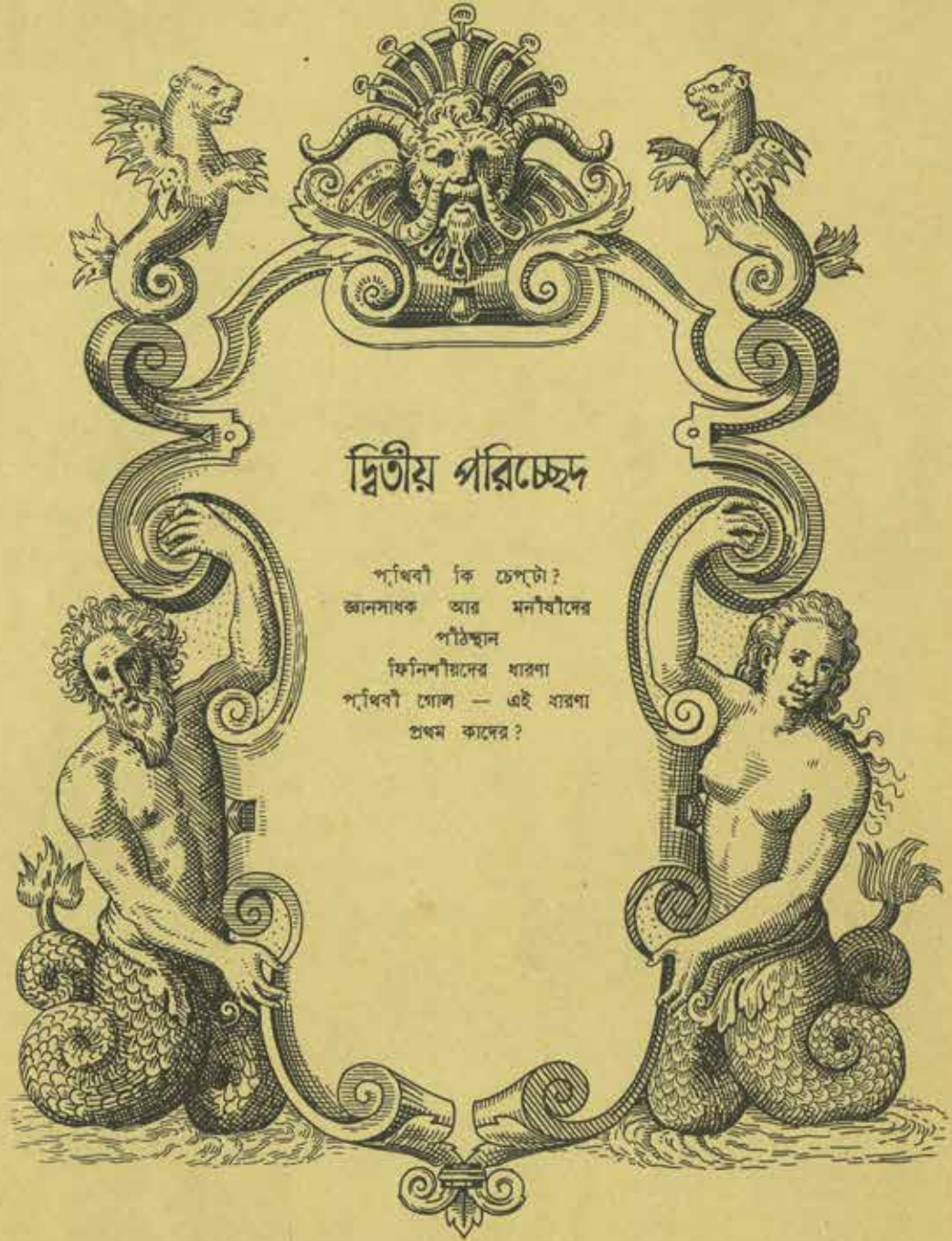
লোকে যত বেশি পৃথিবী পর্যটন করতে লাগল ততই তাদের মাথায় এই চিন্তা এসে ভর করল: 'পৃথিবীটা দেখতে কেমন, কী রকম তার আকার?' বিজ্ঞানীদের মতে, এই নিয়ে সর্বপ্রথম মাথা ঘামান তিয়ান-সিয়া দেশের মহাজ্ঞানীরা। তিয়ান-সিয়া অর্থ হল 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্য'। তোমরা বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করতে পেরেছ যে এটা চীনদেশ — পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্যগুলির একটি। চীনের অবিসংবাদিত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট। সময় সময় নিজেদের রাজ্যের সঠিক সীমানা বার করার কথা একেকজন নতুন নতুন সম্রাটের মাথায় আসে। এই উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে রাজপুরুষেরা নানা দিকে চলে যেতেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেতেন দিব্যি আরামের চক্রযানে। এই ধরনের প্রত্যেকটি শকটের মধ্যে থাকত একটা রহস্যজনক যন্ত্র, যার কাঁটা সবসময় নির্দেশ করত একই দিক। এই যন্ত্র সঙ্গে থাকলে পথ ভুল করার কোন সম্ভাবনা নেই। চীনেরা এর নাম দিয়েছিল 'দক্ষিণ দিগ্‌দর্শন'।

প্রাচীন রহস্যজনক যন্ত্রটি আমাদের কালেও টিকে আছে। আজ সকলে এটাকে বলে থাকে কম্পাস, সকলেই জানে এর রহস্য। এর মধ্যে একটুকু জটিলতা নেই — সাধারণ একটা ছোট্ট বাক্স, তার মধ্যে পিনের ওপর বসানো একটা চৌম্বক কাঁটা। কাঁটার নীল দিকটা দেখায় দক্ষিণ, লালটা — উত্তর।

এই রাজপুরুষ মান্দারিনদের নিয়ে শকট সুদীর্ঘকাল ধরে তৃণভূমি আর মরুভূমির ওপর দিয়ে চলত। কিন্তু সম্রাটের দূতেরা যে দিকেই যান সর্বত্রই দেখতে পান সবসময় সন্ধ্যাকাশে তারাগুলি পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। 'এমনটি হয় কেন?' তাঁরা ভাবলেন। নিজেদের এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা কোনমতেই খুঁজে পেলেন না।

আরেকদল রাজপুরুষ চলে যান পার্বত্যপ্রদেশে। সরু পাহাড়ী পথে গাড়ি চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ভৃত্যরা তাঁদের বয়ে নিয়ে যেত ডুলিতে। রাজপুরুষেরা গুমোট ডুলির ভেতরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে অবাক হয়ে ভাবতেন: 'আচ্ছা, এই স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের একটা অংশ কেন এমন? — এত উঁচু

যে একেবারে আকাশের দিকে উঠে গেছে, অথচ অন্য অংশটা এত নীচু?' কিন্তু এ'রাও নিজেদের প্রশ্নের উত্তর খংজে পেলেন না।

অন্য এক দল রাজপুরুষ যাত্রা করলেন জলপথে — নৌকোয় চড়ে। ছোট বড় নানা নদনদীর ওপর দিয়ে তাঁরা চলেন। খালের ওপর দিয়েও। ভৃত্যরা তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধরে থাকে, মাছি তাড়ায়। রাজপুরুষেরা চিন্তা করতে থাকেন: 'আচ্ছা, এমন হয় কেন যে সম্রাটের রাজ্যের সমস্ত নদনদী বয়ে চলেছে একই দিকে — পশ্চিম থেকে পুবে?' কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও তাঁরা এর ব্যাখ্যা খংজে পেলেন না।

সভাপণ্ডিতরাও এই নিয়ে কম মাথা ঘামালেন না। কিন্তু যেহেতু সম্রাট দাবি করতেন যে তাঁরা যেন অবশ্যই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন সেই হেতু তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটা উত্তর বার করলেন মাথা খাটিয়ে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন: 'আসুন, এই রকম একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক — ধরা যাক পৃথিবী একটা সরা- পিঠের মতো চেপ্টা,

তার ধারগুলো চারকোণা করে কাটা। এই সরা-পিঠে পৃথিবীর প্রতিটি ধারে আকাশের সঙ্গে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি করে উঁচু উঁচু থাম। একটি থাম উত্তরে, আরেকটি পূবে, একটি দক্ষিণে, অন্যটি পশ্চিমে। ভূমণ্ডলের যতগুলি দিক ঠিক ততগুলিই থাম।'

ব্যাখ্যাটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হল, সকলে এতে খুশিও হল। চীনেরা তাদের দেশ নিয়ে পাঁচশ বই লিখে ফেলল। সবগুলি প্রদেশের, এমন কি তার ওধারেও যা ছিল সেগুলির বর্ণনা দিয়ে পাঁচশটি মোটা মোটা কাগজের পাকানো পুথি।

কিন্তু এক সময় বড় রকমের যুদ্ধের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন এমন এক সম্রাট যিনি ড্রাগনের মতো খল, মূর্খও, আর সেই কারণে আরও খল প্রকৃতির। পুথি পড়ে তিনি জানতে পারলেন যে স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও লোকজন বাস করে, আর সবচেয়ে আপত্তিকর কথা এই যে তারা চীনেদের চেয়ে

কোন অংশে খারাপ নয়। সম্রাট তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন যে-সমস্ত পুথিতে ভিনদেশের বর্ণনা আছে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলে দিয়ে চীনেদের সবাইকে যেন এটাই ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের দেশের সীমানার বাইরে আকর্ষণীয় বলে জগতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, খল সম্রাট চীনের নাম পর্যন্ত বদল করে রাখলেন 'জুন্-হুয়া-গো,' যার অর্থ 'বিকশিত মধ্য সাম্রাজ্য।' তখন থেকে চীনেরা তাদের দেশকে ঐ নামেই উল্লেখ করত, যদিও তার বিকাশ ও সৌরভ অতটা মুগ্ধ হওয়ার মতো ছিল না।

রাজপুরুষেরা যাঁকে 'দেবনন্দন' আখ্যা দিয়েছিলেন সেই সম্রাটের প্রজারা যাতে দেশের সীমানার বাইরে নাক গলানোর কথা ভাবতেও না পারে সেদিকে তাঁরা কড়া নজর রাখলেন। তাই তাঁরা আরও একটি নাম দিলেন চীনের — 'সি হাই', অর্থাৎ 'চার সাগর'। রাজপুরুষেরা এটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে চীনই হল পৃথিবী। এর বাইরে আর কিছুই নেই। এর চারদিক ঘিরে আছে উত্তাল সমুদ্র। সেই সব সমুদ্রে কিলবিল করছে বিশাল বিশাল মাছ আর ভয়ঙ্কর সমস্ত ড্রাগন। অনেকেই একথা বিশ্বাস করে ঘরে বসে থাকত।

অনেকে বিশ্বাস করত বটে, কিন্তু সবাই নয়। দূর দূর দেশে প্রাচীনকালের চীনেদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও বিবরণ আজও সংরক্ষিত আছে।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা মধ্য এশিয়ার অপরিচিত দেশেও ভ্রমণ করেন, সেখানেও সংস্কৃতিবান জাতিরা বাস করে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। তাঁরা দেখতে পান সেখানেও লোকে জমি চাষ করছে, নানা রকম হাতিয়ার, বাসন, অলঙ্কার তৈরি করছে। চীনেরা তাদের নিজেদের পণ্যদ্রব্য পশ্চিমের দূর দূর দেশে নিয়ে বিক্রি করছে। কিন্তু বিক্রি করার মতো জিনিসপত্র এখানকার অধিবাসীদের কাছেও আছে। তাদের তৈরি অনেক পণ্যদ্রব্যই চীনা পণ্যদ্রব্যের তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয়।

আর যারা পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে দক্ষিণে এসে পড়ল তারা দেখতে পেল অলোকসামান্য জ্ঞানসাধক ও দার্শনিকদের বাসভূমি, এক আশ্চর্য দেশ — ভারতবর্ষ।

প্রাচীন ভারত এই আখ্যা অকারণে পায় নি। সেই সুপ্রাচীন কালে যখন তার চারপাশের দেশগুলিতে সবে সভ্যতার সূত্রপাত হতে চলেছে, তখনই এখানে, সুনীল-শ্যামল ভারত মহাসাগরের বুকে প্রসারিত জিহ্বা আকৃতির এই বিশাল উপমহাদেশে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ভারতবর্ষ অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। প্রত্যেক রাজার রাজসভায় সভাপণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীদের স্থান ছিল। সকলেই তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা করত।

এ'দের মধ্যে গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ ও ভিষকরা থাকতেন, আর থাকতেন স্রেফ যারা জ্ঞানের উপাসক, শাস্ত্রজ্ঞ — দার্শনিকরা, যাঁরা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বাদির আলোচনা করতেন। তাঁদের বলা হত 'মহাজ্ঞানী'।

এ'দের কল্পনায় আমাদের পৃথিবীটা দেখতে কেমন ছিল?

দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ ছিল। তবে তাঁদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবী চেপ্‌টা। চীনেদের 'সরা-পিঠের' মতো অতটা চেপ্‌টা অবশ্য নয়, অনেকটা বিশাল আকারের এক চেপ্‌টা থালার মতো। থালার ঠিক মাঝখানে আছে মেরুপর্বত। পর্বতের চারপাশে ঘুরছে চন্দ্র, সূর্য আর তারা। এই পর্যন্ত, কিন্তু তার পরই তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মতভেদ।

একদল বললেন গোটা স্থলভাগ চারটি মহাদ্বীপে বিভক্ত, আর সেগুলিকে মেরুপর্বত ও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মহাসাগর। প্রতিটি মহাদ্বীপের নাম হয়েছে সেখানকার উপকূলভাগের একেকটি বিশাল বিশাল বৃক্ষের নামে। তবে মনুষ্যজাতির বাস একমাত্র দক্ষিণের এই মহাদ্বীপে, জম্বুফলবৃক্ষের নামে যার নাম হয়েছে জম্বুদ্বীপ।

আরেকদল কিন্তু এটা মেনে নিলেন না। তাঁদের মতে, জম্বুদ্বীপ মেরুপর্বতের উঁচু চূড়ার চারপাশে একটা বলয় বা মণ্ডলের মতো। লবণের সাগর এই মহাদ্বীপকে পরের মহাদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেটাও বলয়াকার। তবে তার বহিরুপকূল বিধৌত করছে যে সাগর তার জল লবণের নয়, ইক্ষুরসের। মহাজ্ঞানীরা তাঁদের পৃথিবীর এই রূপকল্পনায় সাতটি মহাদ্বীপ বলয়ের উল্লেখ করেছেন। সাতটির প্রতিটিই বিভিন্ন উপাদানে তৈরি সাগর দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে ইক্ষুসাগরের পর আছে সুরাসাগর, তারপর সর্পিঃ (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ এবং অবশেষে জল। এইবার? পৃথিবীর এহেন জমকাল চিত্রকল্পনার বিরুদ্ধে কারই বা কী বলার সাধ্য আছে?

কিন্তু তা সত্ত্বেও মতপার্থক্য দেখা দিল। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে পৃথিবী একটা প্রস্ফুটিত

কমলের মতো। সবচেয়ে বড় বড় চারটি দল — চার মহাদ্বীপ। গর্ভকেশর আর পুংকেশর — ভারতের প্রধান দুই নদনদী সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকার চারপাশে পাহাড়পর্বত। কূলকিনারাহীন সাগরে এই কমলের বৃদ্ধি, সাগরের তলদেশে তার মৃণাল গাঁথা।

এই চিত্রেও কিন্তু সকলে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যাঁরা মানতে পারলেন না তাঁরা পৃথিবীকে কল্পনা করলেন আরেক রূপে। তাঁদের কল্পনায় বিশাল দুগ্ধসাগরে ভাসছে এক দৈত্যাকার কূর্ম। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের খোলের চেয়ে শক্ত জগতে আর কী হতে পারে? কচ্ছপের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারটি হস্তী। জগতে তাদের চেয়ে বলবান আর কে? হাতিরা শুঁড় উঁচিয়ে পৃথিবীর চারদিকে মুখ করে আছে। আর তাদের মহাশক্তিমান পিঠের ওপর ধারণ করে রয়েছে পৃথিবী — চেপ্টা, গোল তার আকার।

আশ্চর্য সমস্ত রূপ কল্পনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞানসাধক আর মনীষীরা!
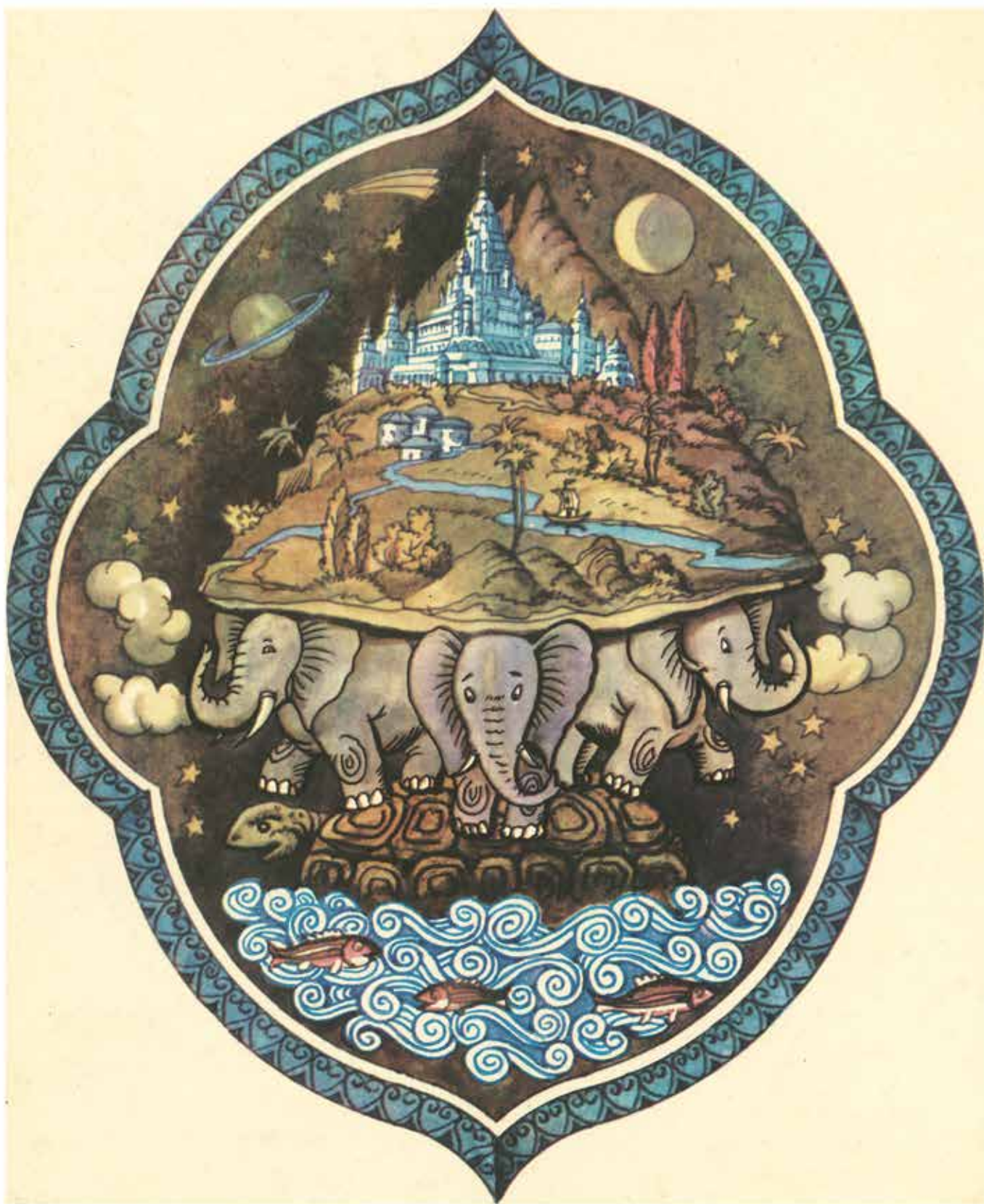
স্বকীয়তার অধিকারী ছিল ফিনিশীয় জাতি। তাদের বাসভূমিও ছিল এক অসাধারণ দেশ। কেননা সত্যি কথা বলতে গেলে কি ফিনিশিআ নামে কোন ভূখণ্ড কস্মিনকালে ছিল না। ভূমধ্যসাগর আর উঁচু পর্বতশ্রেণীর মধ্যে চাপা পূর্ব উপকূলের চিলতে সমতলভূমিকে আসলে প্রাচীন গ্রীকেরা এই নাম দিয়েছিল। আজ সেখানে লেবানন। ফিনিশীয় নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বেশ ভালো ছিল। বাণিজ্যের পসরা নিয়ে অসংখ্য কারাভান মেসোপোটামিয়া ও নীলনদের অববাহিকায় যেত, ভূমধ্যসাগরের সুনীল তরঙ্গবিধৌত সমস্ত দেশে ফিনিশীয়দের জাহাজ যাত্রা করত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপকূলভাগগুলিতে ফিনিশীয় উপনিবেশ তথা বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরপল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঐ সমস্ত কেন্দ্রের কতকগুলি বৃদ্ধি পেতে পেতে পরিণত হল স্বাধীন, শক্তিশালী প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রে। এই প্রসঙ্গে কার্থেজের নাম করা যেতে পারে।

ফিনিশীয় নগরগুলিতে পশম রঙ করার জন্য এক ধরনের আশ্চর্য ঘন লাল রঞ্জক বানানো হত। সেই পশম দিয়ে সবচেয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পোশাক বোনা হত। এছাড়াও এখানে ধাতু গালাই ও ঢালাই করা হত, ধাতু মুদ্রাঙ্কনের কাজ হত, কাচের তৈজসপত্র ও অলঙ্কার তৈরি হত। আর কী সব জাহাজই না ফিনিশীয়রা বানাতে পারত! তাদের চেয়ে ভালো জাহাজ সেকালে আর কেউ গড়তে পারত না। জাহাজ তৈরির কারিগররা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
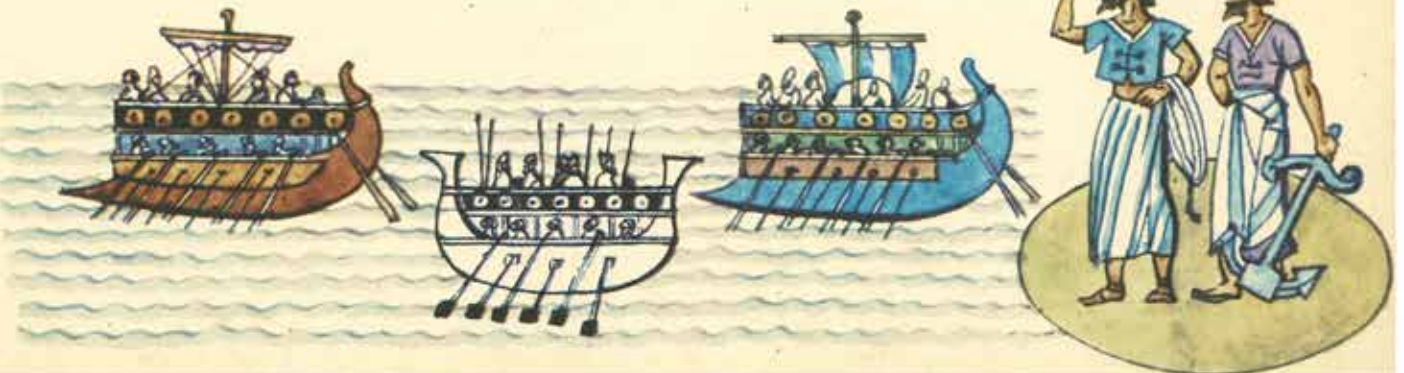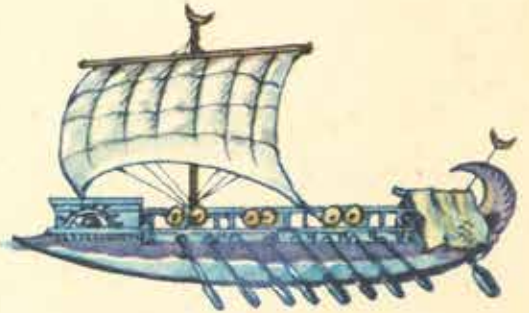
মহীরূহ কেটে জাহাজের চওড়া খোল তৈরি করত। তার ওপর তারা উপরের আরও সমস্ত কাঠামো বানিয়ে মোটা মোটা তক্তা দিয়ে ঢেকে দিত, যাতে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউ দাঁড়িদের গায়ে আছড়ে না পড়ে। দাঁড় চালাতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্য উঁচু উঁচু মাস্তুলের ওপরে পাল খাটানো হত। এ ধরনের জাহাজে তিরিশ জন পর্যন্ত মাঝিমাল্লা থাকত। দুঃসাহসী নাবিকরা কি দেব কি দানব — কাউকেই পরোয়া করত না, বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় তারা করত না। ভূমধ্যসাগরের সমস্ত পথ ফিনিশীয় কান্ডারীদের নখদর্পণে ছিল।

ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়েও তারা যাত্রা করে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিশরের ফারাও দ্বিতীয় নেহো নৌবহর সাজিয়ে ফিনিশীয় অভিযাত্রীদের আফ্রিকার উপকূলভাগ ধরে চলার আজ্ঞা দেন। অভিযাত্রীরা গোটা মহাদেশ ঘুরে অন্য পাশ থেকে দেশে ফিরে আসে।

দুই কার্থেজীয় অভিযানকারী হ্যানো ও হ্যামিলকারের আটলান্টিক মহাসাগর যাত্রার বিবরণ আজও আমাদের জানা আছে। সমুদ্রযাত্রী নাবিকের চেয়ে সেনানায়ক রূপেই বেশি খ্যাতিমান হ্যানো বিভিন্ন সামরিক অভিযানকালে তাঁর নৌবহর নিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দীর্ঘ পথ যাত্রা করেন আর হ্যামিলকার ইউরোপের উপকূলভাগ ধরে দূরে, উত্তরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছান।

দূর সমুদ্রযাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে নাবিকেরা সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন দূরে

স্বদেশের উপকূল দেখা যাবে। ফিনিশীয়রাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এই রকম অপেক্ষার মুহূর্তে তারা কী দেখতে পায় সেটাই লক্ষ করার মতো: সমুদ্রের গভীরতা থেকে সবসময় দূর থেকে প্রথমে কেন যেন চোখে পড়ে স্বদেশের পাহাড়পর্বতের সর্বোচ্চ শীর্ষগুলি। জাহাজ আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এলে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়গুলি। তারও পরে তীরভূমির একেবারে কাছাকাছি আসামাত্র শহরের ঘরবাড়িগুলিও যেন শুশুকের মতো ভুস করে সাগরগর্ভ থেকে জেগে উঠল।

'এমন কেন হয়?' নাবিকেরা অবাক হয়ে ভাবে। 'পৃথিবী যদি চেপ্‌টাই হবে তাহলে ত তার ওপরকার সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ার কথা? যারা বলে পৃথিবী একটা সরা-পিঠের মতো তারা ভুল করছেন না ত? অর্ধেক আপেলের সঙ্গেই এর বেশি মিল দেখা যাচ্ছে নাকি? পৃথিবীর পিঠকে যদি বাঁকা বলে কল্পনা করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে সমুদ্রের ভেতর থেকে কেন আগে জেগে ওঠে পাহাড়ের মাথা, কেনই বা জাহাজের ডেক থেকে যতটা দেখা যায় মাস্তুলের মাথা থেকে তার চেয়েও বেশি দূর দেখা যায়।'

ফিনিশীয় সমুদ্র-অভিযাত্রীরা তাই এই সিদ্ধান্তে এলো যে পৃথিবীর পিঠটা বাঁকা — জলসুদ্ধ থালার ওপর রাখা অর্ধেক আপেল বা কমলালেবুর মতো দেখতে। জল হল সাগর, আর থালার কানার ওপর ঠেক দিয়ে আছে নীলরঙের বিশাল এক ওল্‌টানো গামলা — গগন।

পৃথিবীর অদ্ভুত রূপকল্পনা বটে, তাই না?

পৃথিবী গোল — এই ধারণা প্রথম কাদের?

আজ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই সুপ্রাচীন আমলে প্রতিটি উন্নত রাষ্ট্রে তাদের নিজস্ব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন, আর তাঁদের অনেকের মাথায়ই নানা কারণে এই চিন্তা খেলে। যেমন প্রাচীন গ্রীসের মনীষী পিথাগোরাস মনে করতেন যে গোলক হল সর্বোত্তম জ্যামিতিক আকার। আর পৃথিবী যদি মহাবিশ্বের কেন্দ্র হয়, তাহলে এছাড়া অন্য কি আকৃতিই বা তার হতে পারে? অনেক পণ্ডিতই পিথাগোরাসের সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু এটা কী ভাবে প্রমাণ করা যায়? কী ভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে, বর্ণনা দিয়ে এটা বোঝানো যায় যাতে কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে? এ কাজে সফল হলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল। অ্যারিস্টট্‌ল পরম পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় তাঁর অধিকার ছিল। বিখ্যাত সেনানায়ক মহাবীর আলেকজাণ্ডারের গুরু ছিলেন তিনি। সেকালে এথেন্সে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে তিনিই তার প্রতিষ্ঠাতা। অ্যারিস্টট্‌লের যশ এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহু শিষ্য জুটে যায়। এমন কি আলেকজাণ্ডার মহা সেনানায়ক হওয়ার পরও তাঁর গুরুকে কখনও বিস্মৃত হন নি। বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি গুরুকে পত্র লিখতেন, ভিনদেশ থেকে নানা দুর্মূল্য বস্তুও তাঁকে পাঠাতেন।

খাঁটি পণ্ডিতেরা সচরাচর যেমন হয়ে থাকেন অ্যারিস্টট্‌লেরও তেমনি জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। জ্ঞান এমনই সম্পদ যে তা সঞ্চয় করার মধ্যে কারও লজ্জার কোন কারণ নেই!

সেকালে মানুষ যে সমস্ত জিনিস পর্যবেক্ষণ করে সেগুলির মধ্যে চন্দ্রগ্রহণের রহস্যও ছিল অমীমাংসিত। চন্দ্রগ্রহণ কী থেকে হয়? কেউই ব্যাখ্যা করতে পারত না। একদলের ধারণা, দুষ্ট দানবেরা চাঁদের রুপোলি আলো থেকে সকলকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে চাঁদকে লুকিয়ে ফেলে। আরেক দলের দৃঢ়বিশ্বাস, চন্দ্রগ্রহণ

অ্যারিস্টটল

অমঙ্গলের পূর্বাভাস সূচনা করে — এর ফল হয়ত বা যুদ্ধবিগ্রহ, আর সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী। এমন কি এরকম লোকজনও ছিল যারা চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে দিত যে গ্রহণের ফলে বায়ু বিষাক্ত হয়ে যায়, লোকে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা পড়ে। সরলবিশ্বাসী লোকেরা এই প্রতারণার পাল্লায় পড়ে ভূগর্ভ-কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকত। তারা মাটির প্রলেপ দিয়ে ফাঁকফোকর বন্ধ করত, জানলায় কোন ফাঁক রাখত না।

অ্যারিস্টট্‌ল ভীরু ছিলেন না। তিনি একাধিকবার গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, তাঁর কিছুই ঘটে নি। পর্যবেক্ষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে চাঁদের একপাশের কালো বিন্দুটা আর কিছুই নয় — পৃথিবী যখন চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে আসে তখন পৃথিবী চাঁদের ওপর যে ছায়া ফেলে, তাই। কিন্তু এই ছায়া সবসময়ই গোলাকার হয় কেন?
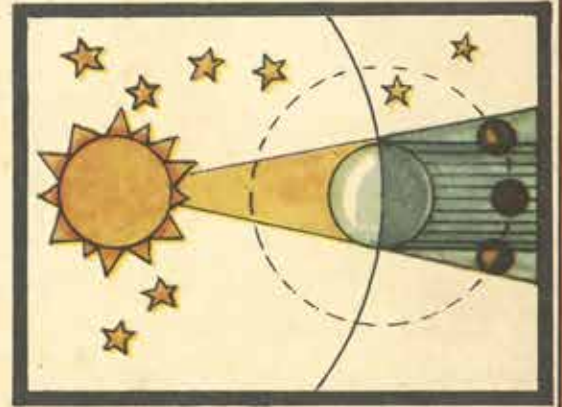
অ্যারিস্টট্‌ল একটা চেপ্‌টা সরা-পিঠে সূর্যের আলোয় বার করে আনলেন। সরা-পিঠেটা একভাবে রাখলে ছায়া হয় গোলাকার, অন্য ভাবে রাখলে হয় একটা ডালের মতো সরু। তার মানে, পৃথিবী চেপ্‌টা সরা-পিঠের আকারের হতে পারে না।

আধখানা কমলালেবু নিয়ে সেটাও তিনি সূর্যের আলোর সামনে ধরলেন। সূর্যের কিরণ যখন কাটা গোল অংশে বা গোলাকার পিঠটার ওপর পড়ে একমাত্র তখনই আধখানা কমলালেবুর ছায়া হয়

বৃত্তাকার। কমলালেবুর আধখানাকে সূর্যের দিকে কাত করে ঘোরানোমাত্রই কিন্তু ছায়া অর্ধবৃত্ত আকার ধারণ করে।

একমাত্র গোটা আপেল বা গোটা কমলালেবুর ছায়া সর্বদাই বৃত্তাকার হবে, তা সে কমলালেবু বা আপেলকে যতই এদিক-ওদিক ঘোরাও না কেন।

'তাহলে আমাদের পৃথিবীর আকারও নিশ্চয়ই গোলকের মতো!' এই বলে অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিষ্যদের দেখালেন কী ভাবে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। শিষ্যরা চোখ বড় বড় করে তাদের গুরুর দিকে তাকাল, সকলের তাক লেগে গেল তাঁর পাণ্ডিত্যে। তবে দুর্বোধ্য রয়ে গেল একটা জিনিস — ভূগোলকের বিপরীত অংশে, নীচেকার অপরার্ধে তাহলে লোকে বাস করে কী ভাবে? মাথা নীচের দিকে করে তারা চলাফেরা করে কী ভাবে আর পড়েই বা না কেন?

এই প্রশ্নের কোন প্রত্যয়জনক উত্তর কিন্তু স্বয়ং অ্যারিস্টট্‌লও দিতে পারলেন না। তখনও ত আর কারও জানা ছিল না যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর পিঠে কেবল লোকজন, পাহাড়পর্বত, বাড়িঘর, নদনদী আর সাগর মহাসাগরকেই ধরে রাখে না, বায়ুমণ্ডলকেও ধরে রাখে।

অ্যারিস্টট্‌লও এটা জানতেন না। তাই স্বয়ং অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিষ্যরা ও অনুগামীরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে আসলে কোন প্রাণীর বসতি নেই। যদিও প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিত দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতিপাদী প্রাণীদের বাস আছে বলে এর আগেই মত পোষণ করতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পৃথিবী পরিমাপ
ফের পিছিয়ে
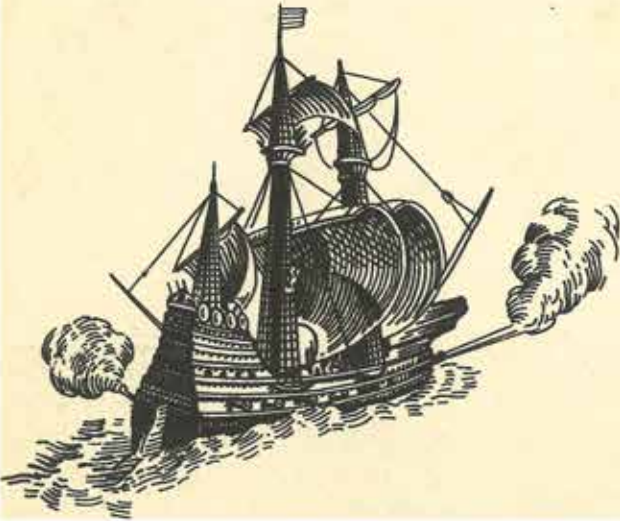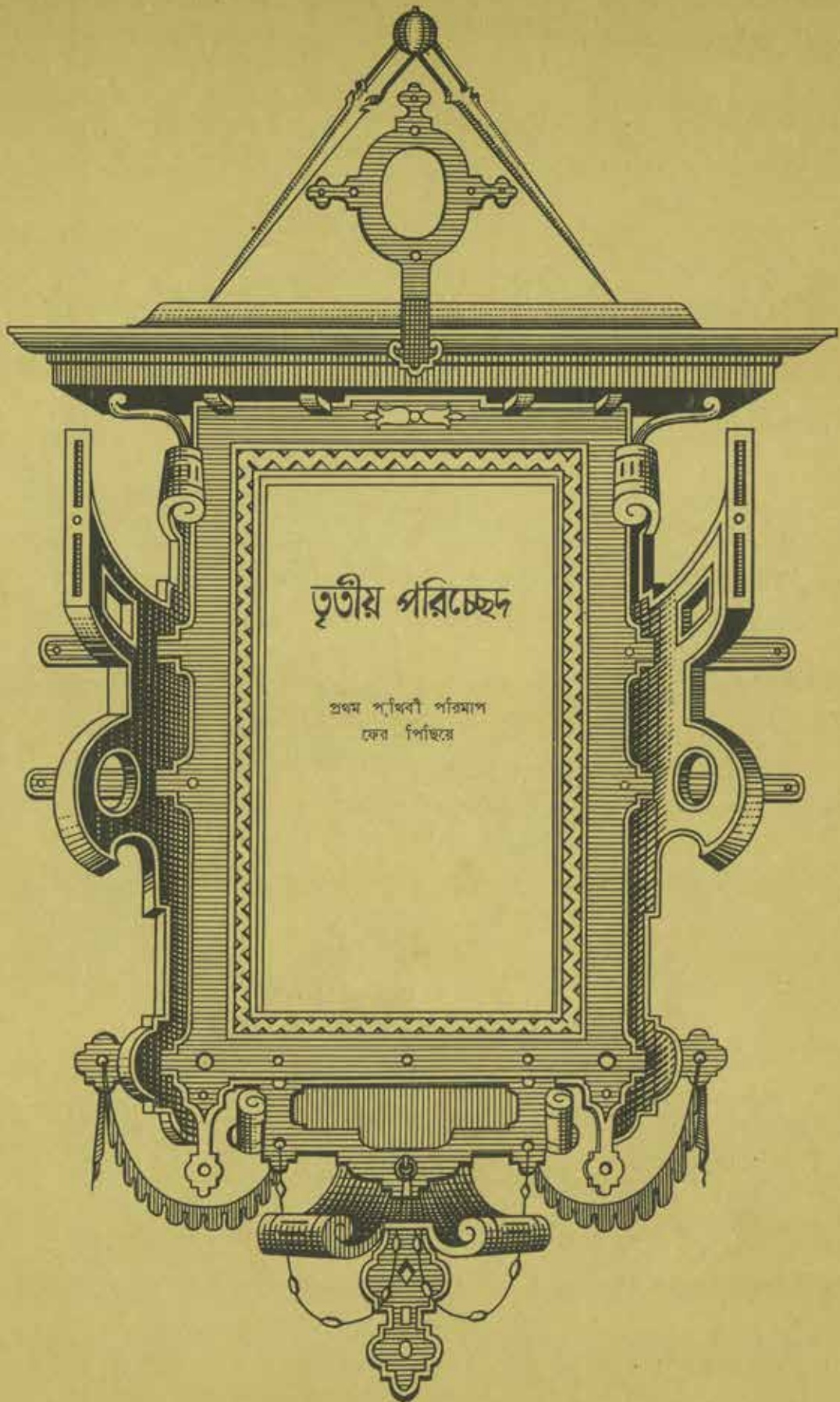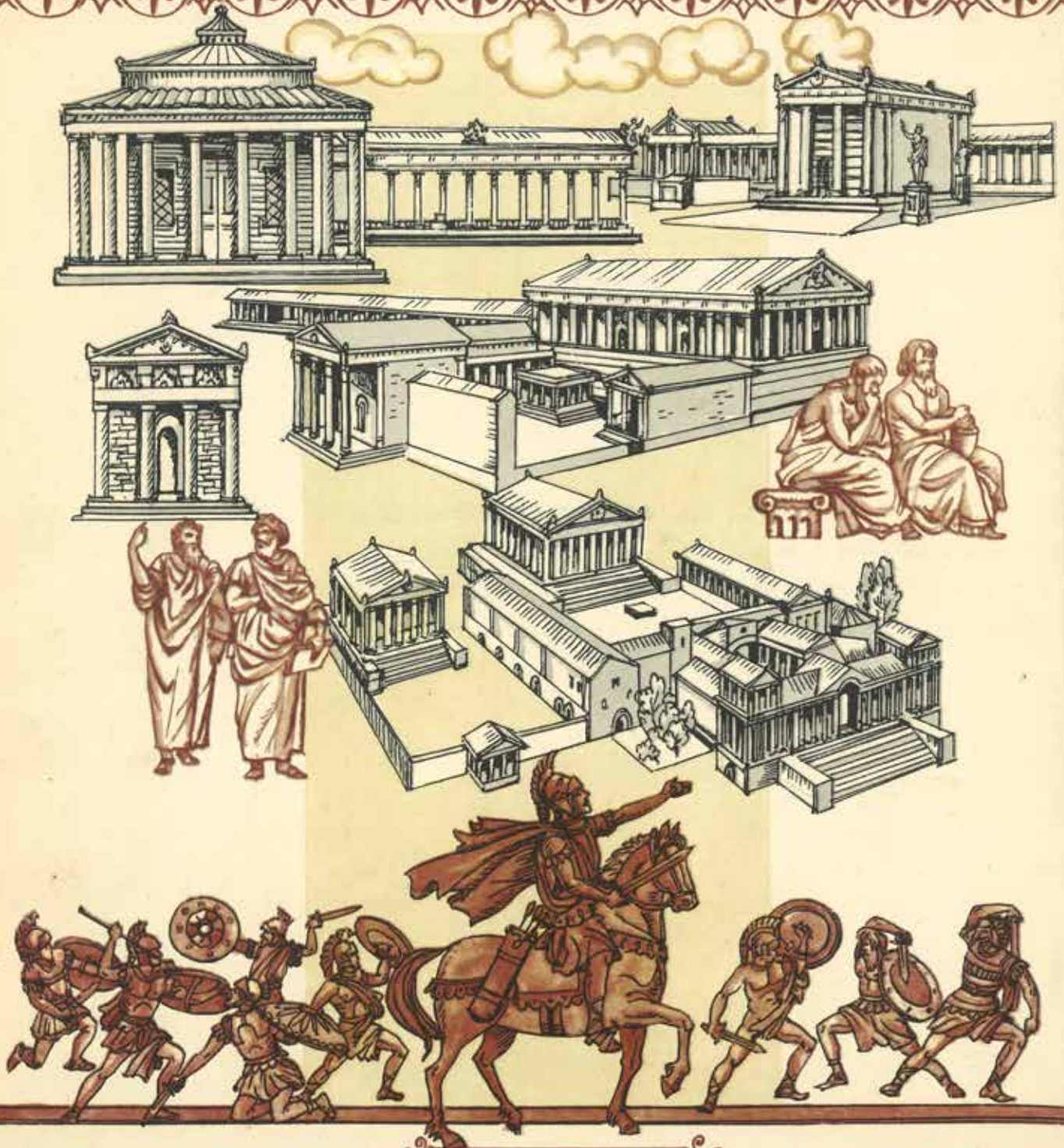
আলেকজান্দ্রিয়া

মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে অর্ধেক পৃথিবী পরিক্রমা করেন। মিশরে, নীলনদের একটি শাখার তীরে, বাণিজ্যপথসমূহের কর্মব্যস্ত সংযোগস্থলে তিনি এক নগর প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। নগরের নাম হয় আলেকজান্দ্রিয়া। বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। নির্বাচিত জায়গাটা লোকের ভালোই লাগল, আর সেখানে বসবাস করতে ইচ্ছুক এমন লোকজনেরও অভাব ঘটল না। শহর তাই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলল। নবাগতরা শহরের চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট আর কাঁচা ইটের তৈরি বহুতলা দালানকোঠা দেখে অবাক হয়ে যেত। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার সত্যিকারের বিস্ময় ছিল তার মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার। মিউজিয়ম অর্থাৎ কাব্য, কলা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী মিউজদেবীদের মন্দির আসলে ছিল বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিজ্ঞান আকাদমি। তাবৎ বিশ্বের জ্ঞানসাধক, কবি ও দার্শনিকরা মিউজিয়মে বাস করতেন, কাজ করতেন। তাঁরা আগ্রহী লোকজনের জন্য ভাষণ দিতেন, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, অভিযান চালাতেন, লিখতেন লম্বা লম্বা কাগজে পাকানো পুঁথি — এই কাগজে পাকানো পুঁথিগুলি আবার মোটা চামড়ার খাপে পুরে রাখা হত। এই খাপগুলি রাখা হত সংরক্ষণাগারে, যার নাম ছিল গ্রন্থাগার। কালে এখানে কয়েক লক্ষ হাতে লেখা পুঁথি জমা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এরাতোস্থেনাস নামে এক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ মিউজিয়মে বাস করতেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের আদি গ্রন্থাগারিকদের একজন। এরাতোস্থেনাসের খ্যাতির বিশেষ কারণ ছিল এই যে সেই সময়কার বিদিত সমস্ত দেশের

ভৌগোলিক বিবরণ লেখা ছাড়াও তিনি ভূগোলকের আয়তন পরিমাপ করেন। ঘটনাটা ঘটে এই ভাবে...

সিয়েনে (মিশরীয় শহর সুন্, বর্তমান আসুয়ানের প্রাচীন গ্রীক নাম) থেকে আগত বণিকদের মুখে তিনি শুনতে পেলেন যে সূর্যের উত্তরায়ণের দিনে — বছরের দীর্ঘতম দিনে — মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ শহরের গভীরতম কূপের তলদেশের জল পর্যন্ত আলোকিত করে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে সূর্যের কিরণ ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে। এরাতোস্থেনাস জানতেন যে সিয়েনে থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তরে দূরত্ব পাঁচ হাজার স্তাদিয়া (এক স্তাদিয়া হল ১৮৫·২৫ মিটার)। এই দূরত্ব পরিমাপ করে কারাভানের দলপতিরা। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় ঐ দিনই সূর্যকিরণ খাড়া হয়ে না পড়ে পড়ছে কাত হয়ে। সূর্যকিরণের এই নতির ফলে যে-কোণ সৃষ্টি হচ্ছে তা একটি পূর্ণবৃত্তে আবদ্ধ কোণের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। এরাতোস্থেনাস এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে দুই শহরের মধ্যকার দূরত্ব হল ভূগোলকের মোট পরিধির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পাঁচ হাজার স্তাদিয়াকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করে এরাতোস্থেনাস পেলেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্তাদিয়া অর্থাৎ আনুমানিক ৪২-৪৩ হাজার কিলোমিটার।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর বৃত্তের মোট পরিধি বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের হিসাবমতে ৩৯,৯৪০ কিলোমিটার। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে এরাতোস্থেনাসের ভুল ছিল নগণ্য।

এরাতোস্থেনাসের রচনার সামান্য কিছু অংশই রক্ষা পেয়েছে। তাঁর রচনা সম্পর্কে আমরা বেশি জানতে পারি পরবর্তীকালের অন্যান্য গ্রন্থকারদের লেখা থেকে।

আর সব প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের মতো এরাতোস্থেনাসও প্রধান মনোযোগ আকর্ষণ করেন ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডের প্রতি। তাঁদের মতে, এই ভূখণ্ডটি মহাসাগর বেষ্টিত এক বিশাল দ্বীপ, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এর অবস্থান। তাঁদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল এই যে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলটি গ্রীষ্মের ভয়ংকর আধিপত্য হেতু বসবাসের অযোগ্য। দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সম্পর্কে অবশ্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেছেন যে সেখানে প্রতিপাদী অধিবাসীদের বসতি থাকলেও থাকতে পারে।

গ্রীকদের বিবরণ অনুযায়ী তাঁদের 'দ্বীপ-ভূখণ্ডের' বহিঃরেখা রঙবেরঙের আয়তক্ষেত্রাকার কাপড়ের টুকরোয় তৈরি এক ধরনের গ্রীক আঙরাখার মতো। এছাড়া দার্শনিকরা স্থলভাগকে ইউরোপ এশিয়া ও লিবিয়া — এই তিনটি অংশে ভাগ করেন। এদিকে রোমকরা লিবিয়া দেশে বসবাসকারী প্রবল পরাক্রান্ত আফ্রিগিয়া গোষ্ঠীর নাম অনুযায়ী লিবিয়ার নাম বদল করে রাখলেন আফ্রিকা।

পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলির মাঝখানের জলভাগ দিয়ে জাহাজ চালানোর সময় নাবিকেরা দিক ঠিক রাখত কী ভাবে? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকে স্তাদিয়া বা দিনের হিসাবে পৃথক পৃথক জায়গাগুলির মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি জানত, একে অন্যকে জানাতও। গতিপথ আরও সহজসাধ্য এবং পথ আরও নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রীক ভৌগোলিকেরা ভ্রমণকারীদের সুপরিচিত জায়গাগুলির উপর দিয়ে কতকগুলি লম্বালম্বি রেখা টানে। সেই রেখাগুলির একটি — মধ্যচ্ছদা —

প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের মধ্যে
তিনিই প্রথম
সমাক্ষরেখা ও মের‌ুরেখার
প্রচলন করেন বলে
ধরা হয়
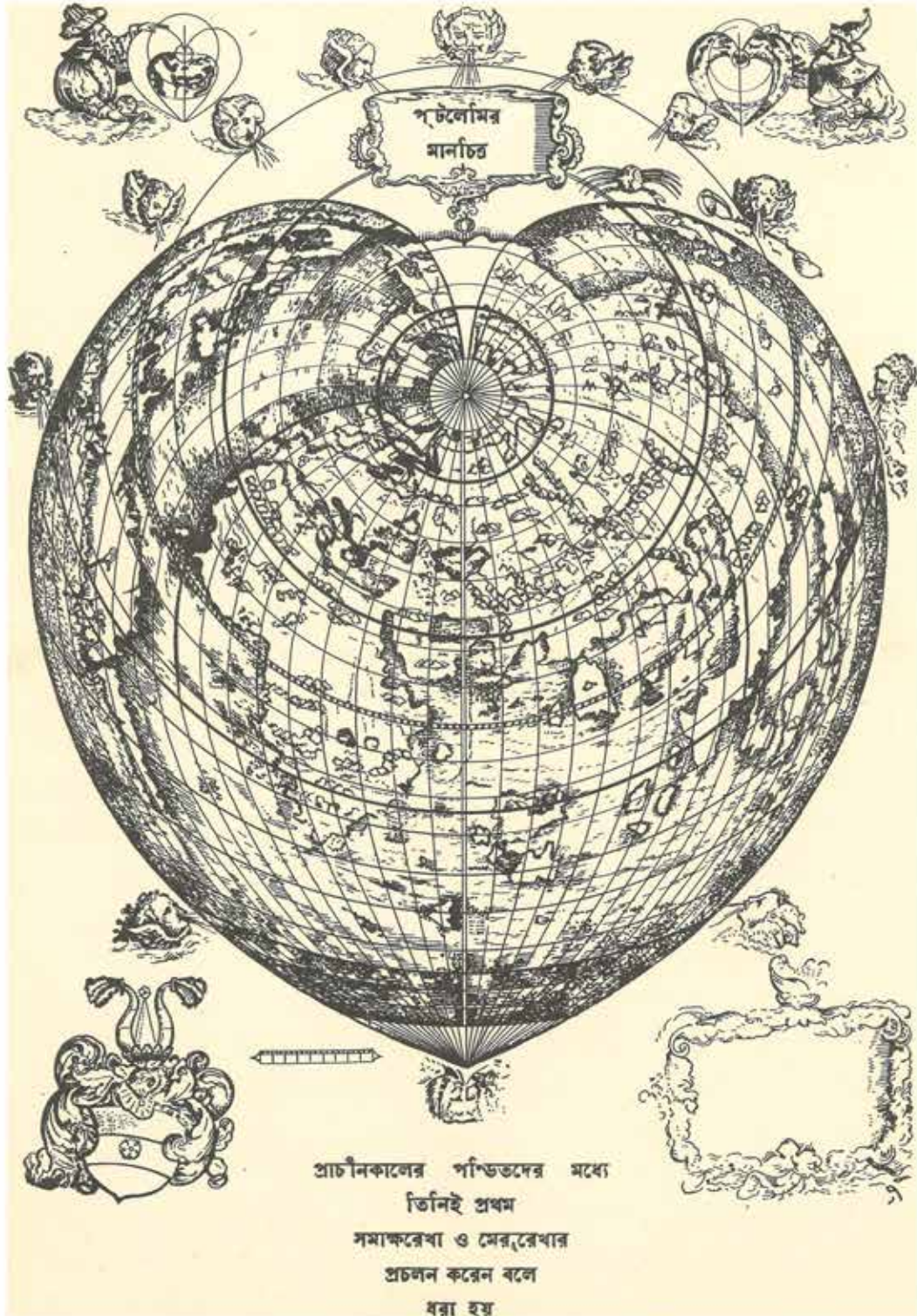
শুরু হয়েছে হারকিউলিস স্তম্ভ (জিব্রাল্টার প্রণালী) থেকে, তারপর ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে, মেসিনা প্রণালী ও পেলোপ্যানিসাসের দক্ষিণপ্রান্ত ভাগ হয়ে চলে গেছে রোড্স দ্বীপের দিকে, আরও দূরে বিস্তৃত হয়েছে এশিয়া মাইনর পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদদেশ বরাবর। মধ্যচ্ছদা বিষুবরেখার সমান্তরালে গিয়ে পৃথিবীকে দুই অংশে ভাগ করেছে। দক্ষিণে নীলনদের উপত্যকায় মেরোয়ে (নুবিয়া, বর্তমানে সুদানের একটি অংশ) রাজ্য থেকে শুরু করে আরেকটি রেখা এই মধ্যচ্ছদাকে ছেদ করেছে। রাজ্যের রাজধানী থেকে এই রেখা নীলনদের ওপর দিয়ে উত্তরে চলে গেছে আলেকজান্দ্রিয়া অবধি, তারপর রোড্স দ্বীপ আর বাইজানটাইমের ভেতর দিয়ে বস্ফরাস বা নীপারের মুখে। এই রেখাগুলি মানচিত্র তৈরির কাজ অনেকাংশে সহজসাধ্য করে তোলে।

তারপর এই দুই রেখার সমান্তরাল আরও নতুন নতুন রেখা প্রাচীন জগতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ওপর দিয়ে টানা হল। আর খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভৌগোলিক ও আবহবিদ ক্লডিয়াস প্টলেমি পুরো মানচিত্রটাকেই নানা সমাক্ষরেখা ও মধ্যরেখায় ঢেকে দিলেন। সমাক্ষরেখাগুলি যায় নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে আর মধ্যরেখা উত্তর মেরু থেকে শুরু হয়ে সেগুলিকে ছেদ করে চলে যায়।

স্থলভাগ যে একটা দ্বীপের মতো, প্রাচীনদের এই মত প্টলেমি মেনে নিতে পারলেন না। ফিনিশীয় নাবিকদের অভিজ্ঞতায় তিনি আস্থা পোষণ করতে পারলেন না। তাঁর মতে, স্থলভাগ উত্তরে না দক্ষিণে কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে এ সম্পর্কেও সঠিক কথা কেউ বলতে পারে না। এই কারণে প্টলেমি তাঁর পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করার সময় স্থলভাগের প্রান্তদেশ পর্যন্ত স্রেফ টেনে বাড়িয়ে লিখে দিলেন যে এরপর আছে 'অপরিচিত ভূমি'।

এশিয়ার উত্তরে ও পূবে অথবা আবিসিনিয়ার দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ মহাসাগর আছে সেকথা তিনি কোনমতেই মানতে নারাজ। তাঁর বর্ণনার ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা নতুন করে পৃথিবীর যে মানচিত্র গঠন করলেন তাতে ভারত মহাসাগর চারপাশ থেকে বদ্ধ এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছে আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অজানা স্থলভাগের সাহায্যে সংযুক্ত হয়েছে সরাসরি পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে।

কার কথা তবে সত্যি? এরাতোস্থেনাসকে যদি মানতে হয় তাহলে সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের পক্ষে জাহাজে চড়ে পৃথিবীর যে কোন দূর দেশে পৌঁছুন সম্ভব। আর প্টলেমি যদি সত্যি হন তাহলে জাহাজের চলাচল বদ্ধ সাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই দূরযাত্রায় স্থলপথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

ক্লডিয়াস প্টলেমি প্রাচীন বিজ্ঞানের শেষতম উজ্জ্বল ধারক রূপে গণ্য। তিনি এমন এক যুগের মানুষ যখন প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির দীপশিখা নিভু নিভু। সেই সময় পৌত্তলিকতার স্থান নিতে চলেছিল নতুন নতুন ধর্মবিশ্বাস। পৃথিবী যে চেপ্টা এই ধারণা ফের এশিয়ায় ও ইউরোপে ব্যাপক প্রসার লাভ করল। বলাই বাহুল্য আমাদের গ্রহের সঠিক আকার জানার পথে এটা ছিল পিছু হটা।

আমার বাড়িতে বইয়ের আলমারিতে প্রাচীন স্লাভ ভাষার পুরনো অক্ষরে হাতে লেখা এক পেল্লাই পুথি আছে। বইটার নাম: 'সমগ্র ভূমণ্ডল ব্যাপনকারী খ্রীষ্টসংক্রান্ত গ্রন্থ'। রচয়িতা কোজ্মা নামে ষষ্ঠ শতাব্দীর এক গ্রীক বণিক। ইণ্ডিকোপ্লভ নামেও তিনি পরিচিত। এই শেষোক্ত নামটি রীতিমতো সম্মানসূচক, কেননা তার অর্থ, এই নামধারী ব্যক্তিটি দূর ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন।

কোজ্মা অবশ্য বাণিজ্যসূত্রে সত্যিই অনেক ভ্রমণ করেন। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর তখনই, মঠে থাকাকালে তিনি পৃথিবীর গঠনবৃত্তান্তসংক্রান্ত বইটি লেখেন। সন্ন্যাসধর্মগ্রহণকারী এই ভূপর্যটক বণিকের বৃত্তান্তের ভিত্তি খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেলের মত অনুসরণ করে তিনি লিখেছেন যে পৃথিবী চেপ্টা আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্রাকৃতি পৃথিবীর চারধারের তীরভূমি মহাসাগরের তরঙ্গমালাবিধৌত, আর মহাসাগর নিজেও উঁচু প্রাচীরে আবদ্ধ। প্রাচীরের ওপর ভর দিয়ে আছে দৃঢ়, স্বচ্ছ, গম্বুজাকৃতি নভোমণ্ডল। দেবদূতেরা নভোমণ্ডলের ওপরে চালাচালি করছেন নক্ষত্র।
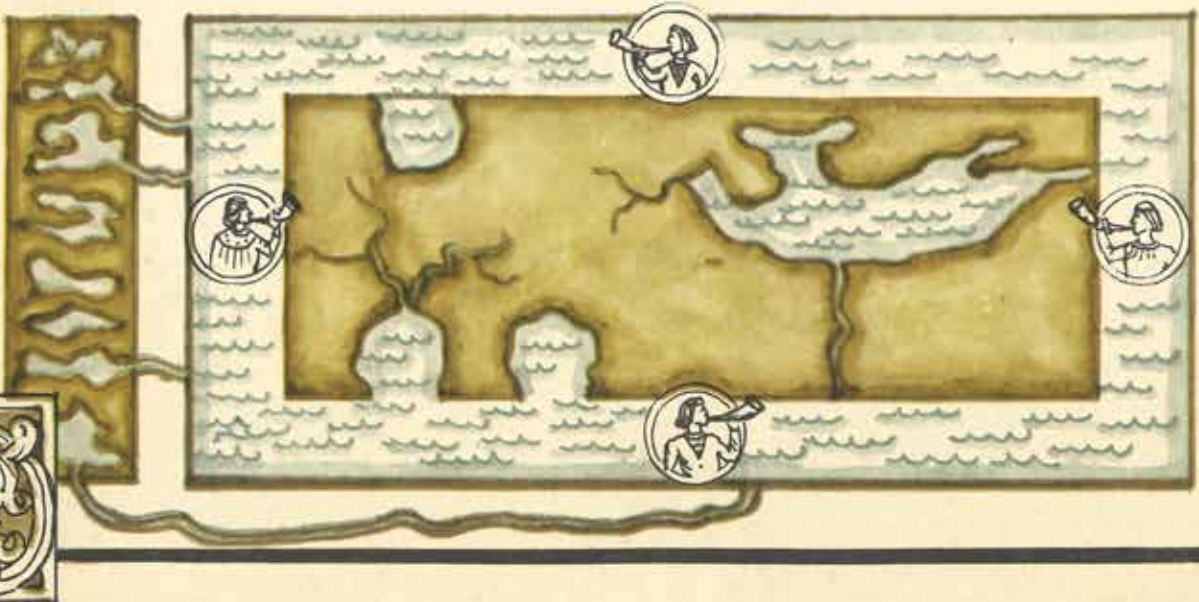
কোজ্‌মার মতে, আকাশের শক্ত চালার ওপাশে সংরক্ষিত আছে দিব্য বারি। এই দিব্য বারিই সময় সময় বৃষ্টি হয়ে আমাদের পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। আর উত্তরে এই শ্রদ্ধেয় বণিক স্থান দিলেন এক উ'চু পাহাড়ের। আকাশপরিক্রমা কালে সূর্য এর আড়ালে অন্তর্ধান করে। তখনই পৃথিবী জুড়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে রাতের আঁধার।

বইটিতে অনেক ছবি আঁকা। কিছু কিছু ছবি রুশী অনুলিপিকররা মূল গ্রীক থেকে নিয়েছেন, কিছু নিজেরাই কল্পনা করে এ'কেছেন। কোজ্‌মা যে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করেছেন সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের চোখে যা যা দেখেছেন তা বাদে অনেক শোনা কথাও লিখেছেন। তাই উট, ষাঁড় বা হাতির মতো সচরাচরদৃষ্ট জীবজন্তুর পাশাপাশি ছবিগুলিতে কাল্পনিক 'গজবরাহ', 'নাসিকাশৃঙ্গ' ও 'একশৃঙ্গদানব'ও দেখতে পাওয়া যায়।

এই বইটি যে কবে প্রথম রুশদেশে আসে বলা কঠিন। অনুবাদকের নামও জানা যায় নি। তবে অনেককাল আগেকার ঘটনা বটেই। সব দেশের লোকই ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে অথবা শুনতে ভালোবাসত। লেখাপড়া জানা রুশীদেরও আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক কোজ্‌মার বইটি পছন্দ হয়। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করতে পার: 'এর মধ্যে এত উদ্ভট উদ্ভট কল্পনাই যদি থাকে তবে পছন্দ হল কী করে?' পছন্দ করার কারণ প্রথমত এই যে, লোকে এটা জানত না, তারা সবটাই সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁর বৃত্তান্ত পড়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও দূর দূর দেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রাচীন রাশিয়ায় সাগরপারের দেশের বর্ণনা ও পৃথিবীর গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে গ্রন্থাদি খুব একটা কম ছিল না। একটি বইয়ের নাম ছিল 'অগাধগ্রন্থ' — 'অগাধ' এই কারণে যে তাতে অগাধ জ্ঞানের কথা, তত্ত্বকথা নিবদ্ধ ছিল। এই গ্রন্থে কল্পিত জ্ঞানী পুরুষ দাভিদ এভসেইয়েভিচ বলছেন যে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে 'তিমিমাছ'। 'তিমিমাছ যেই পাশ বদল করে অমনি জননী বসুন্ধরা আগাগোড়া টলমল করে ওঠেন।'

মধ্যযুগে সবচেয়ে দুঃসাহসী ভ্রমণকারীরূপে দেখতে পাই আরবদের। সপ্তম শতাব্দীতে বিশাল ভূখণ্ড জয় করার পর তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য চালানের কাজ শুরু করেন। আরবীয় বণিকেরা পূর্ব ইউরোপ, স্লাভ ভূখণ্ডের সবগুলি দেশ এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। তাঁরাই প্রথম বিষুবরেখার খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকার আশ্চর্য আশ্চর্য দেশের বিবরণ দেন, মাদাগাস্কার দ্বীপ সমেত পূর্ব আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটান।

তৎকালীন ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিত যে সমস্ত বিবরণ আমাদের
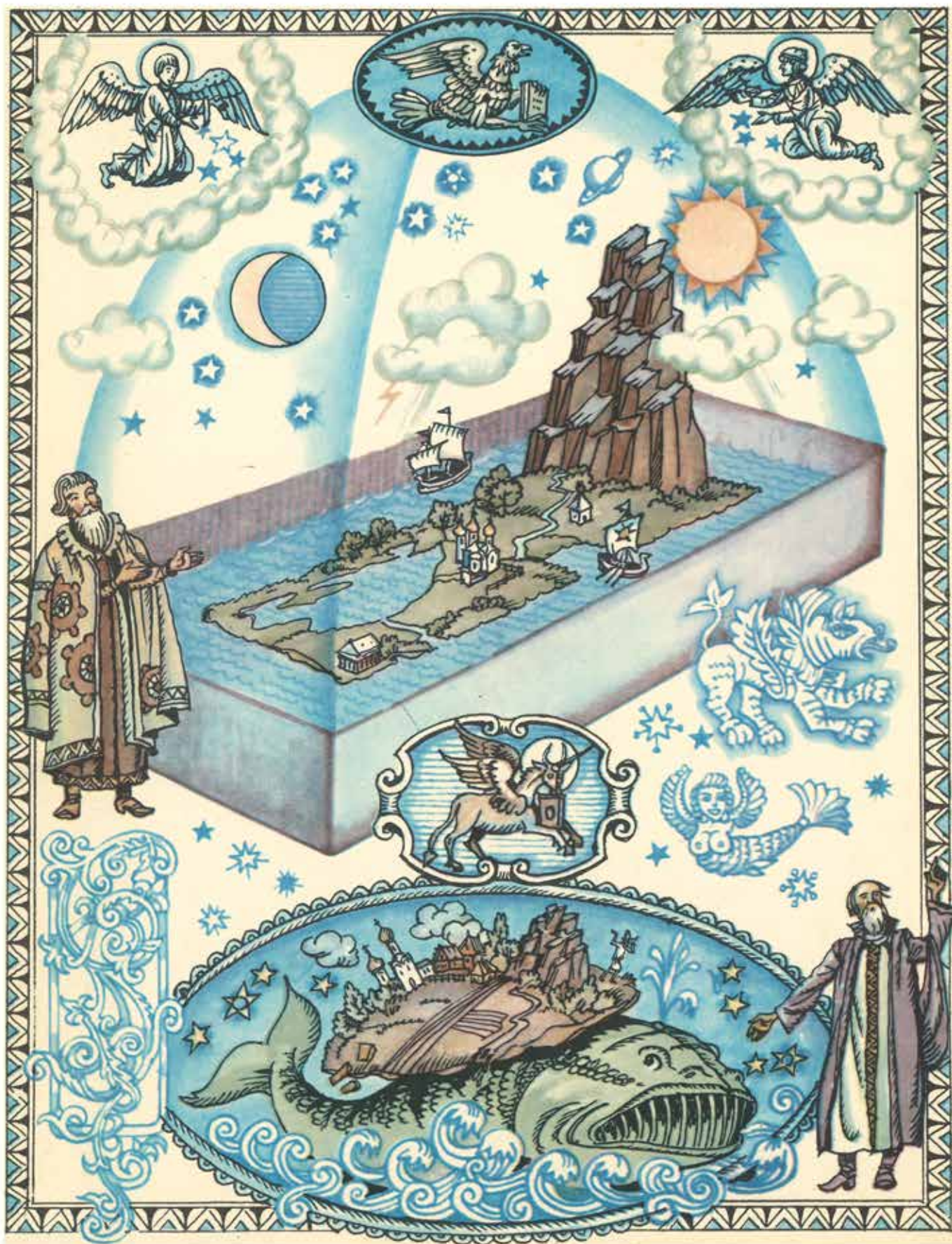
হাতে এসে পড়েছে সেগুলির একটির রচয়িতা হলেন নবম শতাব্দীর পারস্যদেশীয় পণ্ডিত ইব্‌ন হর্‌দাবেহ্‌। বইটির নাম 'বিভিন্ন পথ ও রাজ্যের বিবরণী গ্রন্থ'। নিজে তিনি ভ্রমণ করেন কম। কিন্তু বাগদাদের খলিফার দরবারে থাকার ফলে আরবীয় বণিক, কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অসংখ্য তথ্য কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

ইব্‌ন হর্‌দাবেহ্‌-এর স্বল্প কিছুকাল পরে দেখা দিল পর্যটক ইব্‌ন রশীদ-এর লেখা বিবরণ। তিনি নিজে যা দেখেছিলেন তাই লেখেন। তিনি তাঁর রচনার নাম দেন 'রত্নকোষ'। পাণ্ডুলিপির শেষ — সপ্তম পরিচ্ছেদ আজও রয়ে গেছে। পূর্ব ইউরোপের জাতিবর্গ সম্পর্কে নানা তথ্য ঐ অংশে আছে। সেখানে ইব্‌ন রশীদ যে স্লাভজাতি ও কিয়েভ রুস্‌ (প্রাচীন রাশিয়া ঐ নামেই পরিচিত ছিল)-এর বিবরণ দিয়েছেন পশ্চিম ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা তাদের সম্পর্কে অতি সামান্য জানত।

দশম শতাব্দীতে পূর্ব ইউরোপের জাতিবর্গ সম্পর্কে আরও তথ্য দেন ইব্‌ন ফাদ্‌লান তাঁর লেখা 'ভোল্‌গাযাত্রায়'।

বাগদাদনিবাসী মাসুদি পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত দেশ, ককেশাস ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করেন। কারাভানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন, চীন আর যবদ্বীপও তিনি জানতেন। তাঁর লিখিত একটি গ্রন্থের নাম 'সুবর্ণভূমি ও হীরকখনি', অন্যটি — 'সমাচার ও পর্যবেক্ষণ'।

মধ্যযুগীয় এমন অনেক পর্যটকের কথা আমি তোমাদের বলতে পারি যাঁরা আমাদের জন্য মহামূল্যবান রচনার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। যেমন উল্লেখ করতে পারি খরেজ্‌মনিবাসী জ্ঞানকোষ রচয়িতা পণ্ডিত আল্‌-বিরুণীর নাম; নাম করা যায় সর্বকালের, সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ পর্যটক ইব্‌ন বতুতার, যিনি তাঁর পঁচিশ বছর পর্যটন-জীবনে অন্ততপক্ষে ১,২০,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দেন। কিন্তু মুসলিম পর্যটক ও ভৌগোলিকরাও পৃথিবীকে চেপ্‌টা বলে কল্পনা করেন।

কেবল তফাত এই যে খৃষ্টানদের মতো পৃথিবীর আকার আয়তক্ষেত্র না বলে তাঁরা বলেছেন গোল। তাঁরা তাঁদের মানচিত্রে পৃথিবীর এমন চিত্রই এঁকেছেন। এই রকম একটি চিত্রের কথা আমি তোমাদের আরও পরে বলব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানচিত্র উদ্ভাবন
আরবদেশীয় ভৌগোলিকের রৌপ্যমানচিত্র
ঘরকুনোদের জন্য মানচিত্র
দূরে যাত্রার মানচিত্র

দ্বাদশ শতাব্দীর মানচিত্র
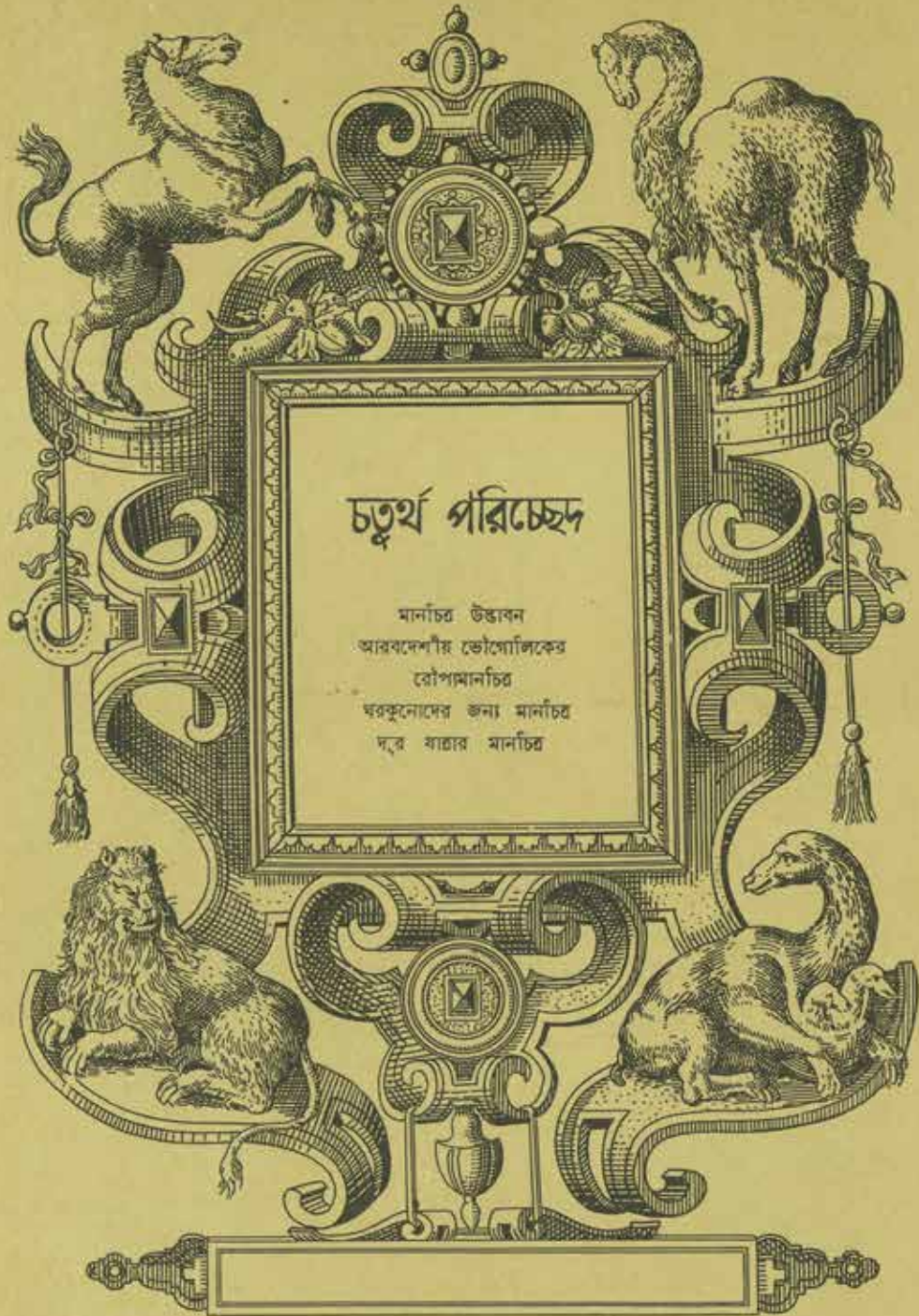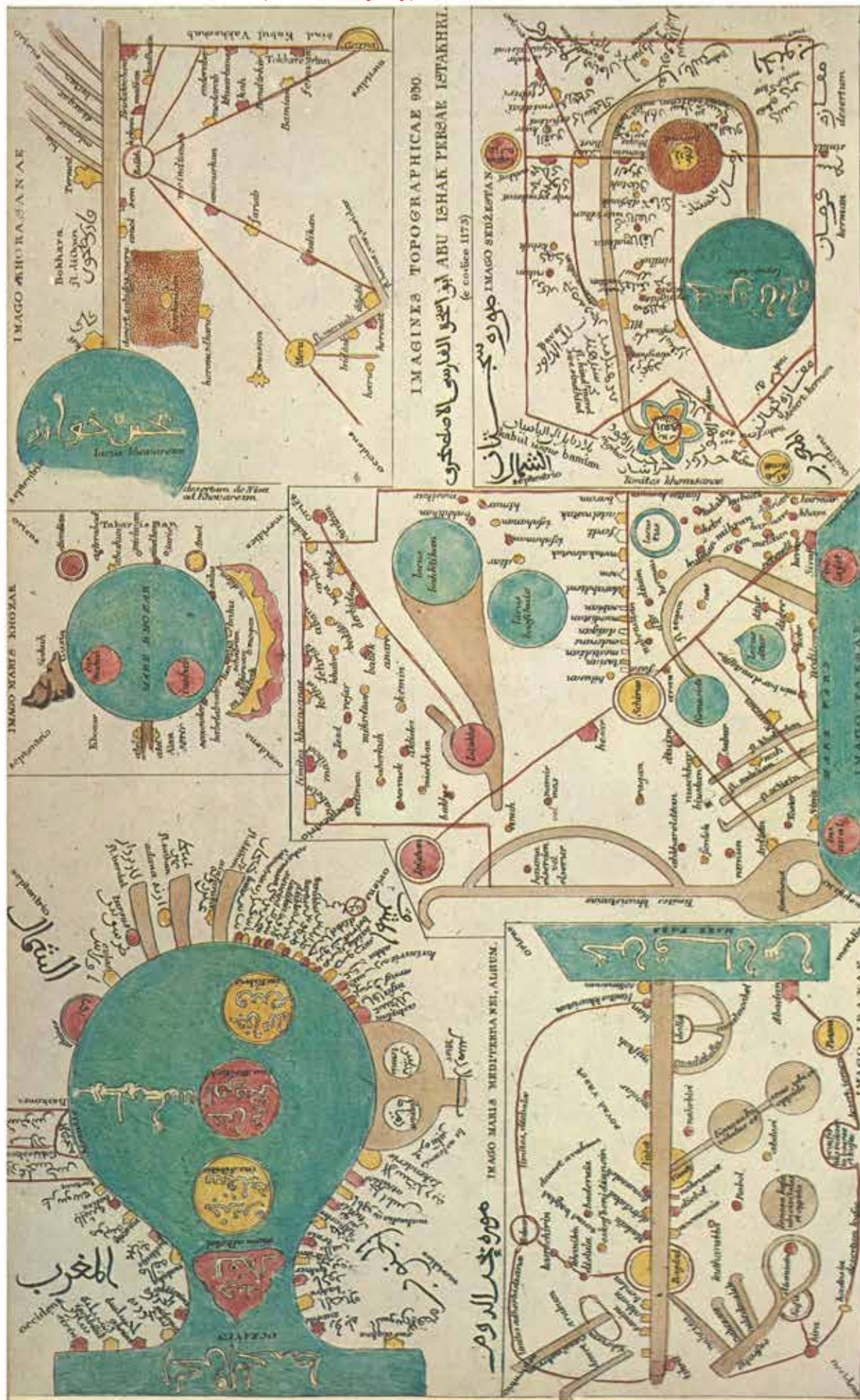
সুপ্রাচীনকালে লোকে তাদের আশপাশ অঞ্চলের নক্সা আঁকতে পারত। তা নইলে কী করেই বা বোঝানো যায় কোথায় ভালো শিকার পাওয়া যায়, কোথাকার ফলমূল বেশি মিঠে? পরে এই আদিম ভৌগোলিকরা তাদের নক্সায় আশেপাশের পল্লীগুলিরও ছবি আঁকতে লাগল। ছোট ছোট পথরেখা এ'কে সেগুলি যুক্ত করল। আর যখন প্রথম কারাভান বাইরের দেশে যাত্রা করল তখন কারাভান চলার দীর্ঘ পথঘাটের নক্সা এবং বিবরণও তৈরি করতে হল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সিমান্দর তৎকালীন পরিচিত বহু বিবরণ সংগ্রহ করে সমগ্র পৃথিবীর একটা নক্সা আঁকার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সৃষ্টি হল প্রথম মানচিত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষ্ণসাগরের অদূরে মাইকোপ নামে একটি শহর আছে। বেলায়া নদীর তীরে এই শহর। তেমন একটা পুরনো নয়, একশ বছরের সামান্য ওপরে হতে পারে তার বয়স। শহরের অদূরে উ'চু হয়ে আছে একটা ঢিবি। কবে যে ওখানে মাটি স্তূপাকার করা হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। কেনই বা করা হয়েছিল তাও লোকে বহুকাল হল ভুলে গেছে। অবশেষে একদিন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন ঢিবিটা খ‍ুড়েই দেখা যাক না। হতে পারে যে ওর ভেতরে এমন সমস্ত জিনিস আছে যা থেকে কোন এক সময় এখানে সংঘটিত ঘটনার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব!

যা বলা তাই কাজ। বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য তৈরি হলেন পণ্ডিতেরা। ঢিবিটার কাছে এলেন তাঁরা। কোপানো শুরু হয়ে গেল। এক দিন গেল — কিছুই না। দুদিন যায়, তিনদিন যায় — কোদালে ওঠে কেবল চাপ চাপ মাটি, কেবল বালি আর পাথর উড়তে থাকে খোঁড়া জায়গাটার ভেতর থেকে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁরা তখন ভাবতে শুরু করেছেন এই বাজে কাজে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। এমন সময় তাঁরা সন্ধান পেলেন গুপ্তধনের।

গুপ্তধনই বটে! কী নেই সেখানে! মাটিতে চাপা পড়ে ছিল একটা সমাধি। সমাধির মাথার ওপরে সোনার তবকে কারুকাজ করা জমকাল চাঁদোয়া। চাঁদোয়াটা খাড়া আছে চারটে রুপোর থামের ওপর। প্রতিটি থামের শেষ প্রান্তে রুপো আর সোনার তৈরি একটি করে পাকানো শিঙওয়ালা ষাঁড়ের অপূর্ব মূর্তি। এরই পাশে খ‍ুড়ে পাওয়া গেল সোনারুপোর সুন্দর তৈজসপত্র, বহু রকমের অলঙ্কার। সমস্ত হাতিয়ার আর অস্ত্রশস্ত্র ছিল পাথর আর খাঁটি তামার তৈরি। চমৎকার গুপ্তধন!

বোঝাই যাচ্ছিল কোন এক সময় কোন এক বড় ও ঐশ্বর্যবান গোষ্ঠীর দলপতি মারা যায়। হয়ত বৃদ্ধ বয়সে মারা যায়, হয়ত বা শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, লোকটি এতই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল যে যোদ্ধারা পরম সম্মানের সঙ্গে তাকে সমাধিস্থ করে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা যাতে বেশি উল্লসিত হন তা সোনা নয় রূপোও নয়। উদ্ধার করা সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের ছিল চার ধারে আঁকা গোলাকার চীনেমাটির কিছু পাত্র। ঐ কলসীগুলির ভিতরে কোন এক সময় তৈল ও সুরা রাখা হত। অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা মাটির গায়ে এ'কে রেখেছেন ককেশাস পর্বতমালা আর নদী — যে নদী ঐ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। দেখতে হয়েছে সত্যিকারের নক্সা, আর এমনই নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে আঁকা জায়গাগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদদের বার করতে কোন বেগ পেতে হল না।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল উদ্ধারপ্রাপ্ত নিদর্শনের বয়স। পাত্রগুলি কম করে হলেও চার হাজার বছরের পুরনো! সেই সময় এখানকার তৃণভূমিতে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলির পক্ষে অক্ষরপরিচয় না জানাই ছিল স্বাভাবিক, অথচ এলাকার মানচিত্র তারা ঠিক আঁকতে পারত।

সম্প্রতি তুরস্কদেশে খননকার্য করে প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের সময় প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটির ফলকের গায়ে আঁচড়-কাটা নক্সার সন্ধান পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিদর্শনটি নয় হাজার বছরের পুরনো। আজ এই মানচিত্রটি পৃথিবীর প্রাচীনতম রূপে গণ্য। সত্যি সত্যিই তাই কিনা কে বলতে পারে? বলা যায় না কোথাও হয়ত আরও পুরনো আছে? নেহাৎ আমরা খুঁজে পাই নি এখনও?
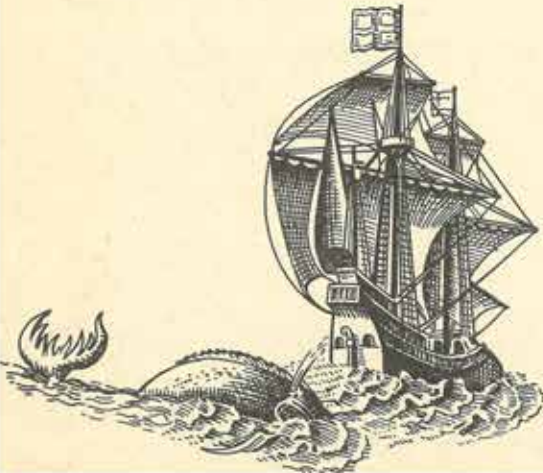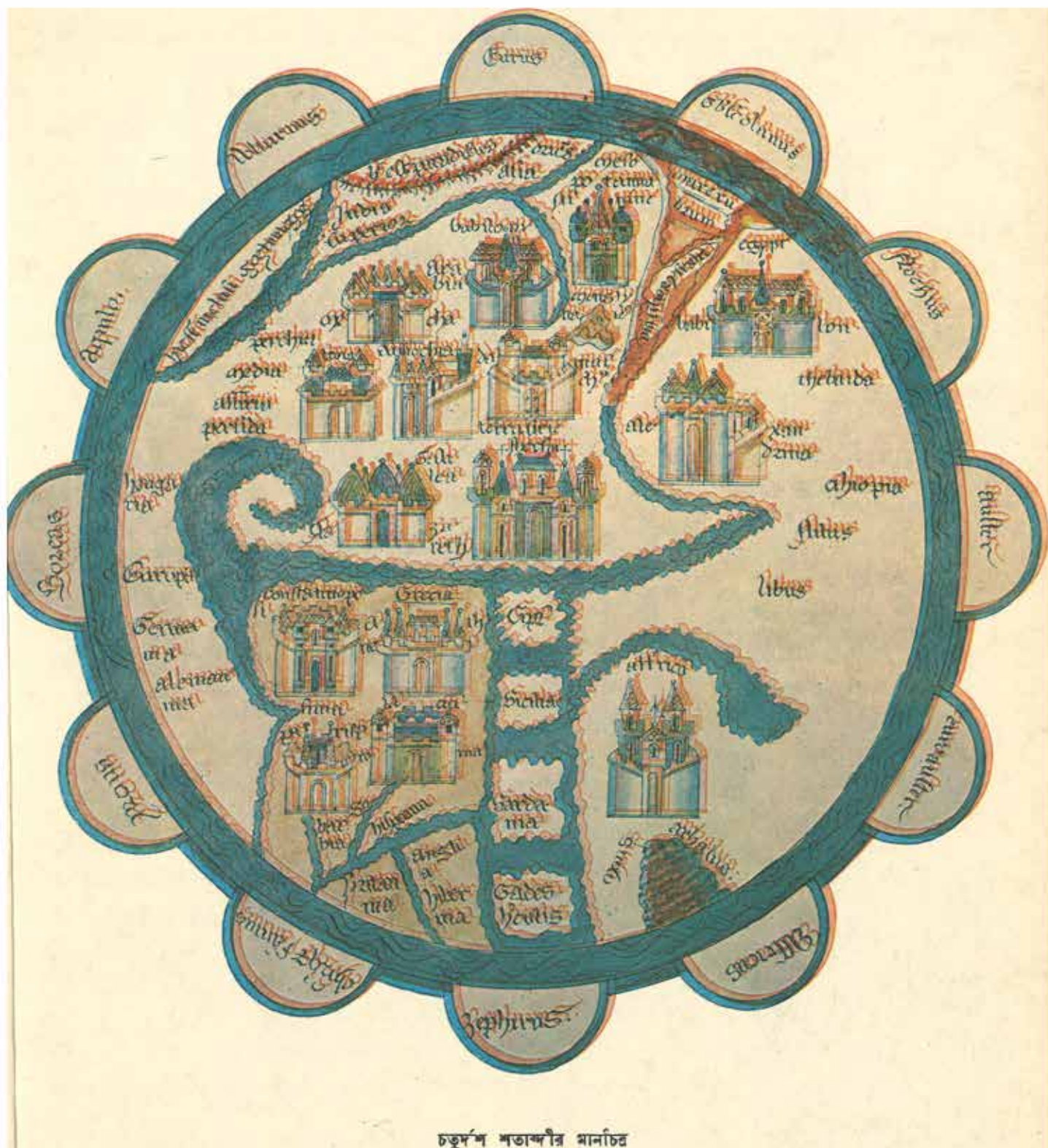
চতুর্দশ শতাব্দীর মানচিত্র

উষ্ণ ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে সিসিলি একটা বড় দ্বীপ। সেখানকার পালের্মো শহরে আবু আবদাল্লা মহম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিসি নামে এক আরব ভূগোলবিদ পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী রাজপরিবারের সন্তান। বহু বছর তিনি অধ্যয়ন করেন, বহু ভ্রমণ, করেন, পরম জ্ঞানীপুরুষরূপে পরিচিত হন।

সেই সময় পালের্মো শাসন করতেন সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার। জন্মসূত্রে তিনি ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নর্মাণ্ডির লোক, কিন্তু ভাগ্যের তাড়নায় তিনি এসে পড়েন উষ্ণ জলবায়ুর দেশ সিসিলিতে। এখানেই থেকে গেলেন। রাজা রজার উত্তরের দেশগুলি খুব ভালো জানতেন, এর জন্য তাঁর গর্ব ছিল, তিনি ভূগোলের ভক্ত ছিলেন। (অবশ্য এটাই স্বাভাবিক — আমরা যা বেশি ভালো জানি, তাই বেশি ভালোবাসি।)

ভূগোলবিশারদ পণ্ডিতের কথা রাজার কানে গেল। লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন দক্ষিণের দেশগুলি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো জ্ঞান আর কারও নেই। রজার তখন পৃথিবীর বসতিপূর্ণ সমস্ত ভূভাগের যতদূর সম্ভব বিশদ ও যথাযথ, সুবৃহৎ এক মানচিত্র যৌথভাবে রচনার উদ্দেশ্যে ইব্‌ন ইদ্রিসিকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন।

ভাবনা ও জ্ঞান আশ্চর্য জিনিস বটে! — রূপকথার সেই টাকার মতো — যতই খরচ কর না কেন কোন শেষ নেই। প্রাচীন প্রবচনের ভাষায়: তোমার আমার দুজনের কাছেই যদি একটি করে আপেল থাকে, আমরা দুজনেই যদি নিজেদের মধ্যে তা বদলাবদলি করি, তাহলেও আমাদের একটি করে আপেল থেকেই যায়। কিন্তু তোমার আমার দুজনেরই যদি ভাবনা আর জ্ঞান থাকে, আর তা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করি, তাহলে দুজনের প্রত্যেকের ভাবনা ও জ্ঞান হবে দ্বিগুণ বেশি।

ইব্‌ন ইদ্রিসি রাজার সঙ্গে কাজ করতে রাজী হলেন, কেননা তাঁরা দুজনে মিলে মানচিত্র আরও পরিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন।

'কিন্তু এত বড় একটা কাজ কোন্ উপাদানের ওপর রূপদান করা উচিত?' ভৌগোলিককে রাজা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মনে হয় সাধারণ কাগজ তাঁদের মানচিত্রের পক্ষে বড় বেশি সাদামাঠা, আর

তা টেকসইও হবে না। আরবদেশীয় পণ্ডিত কী উত্তর দেন জানা যায় নি। কিন্তু রাজা তাঁর কোষাগার থেকে সমস্ত রুপো বার করে এনে তা গলিয়ে ও পিটিয়ে যত বড় আকারের হতে পারে একটা গোল রুপোর পাত বানানোর হুকুম দিলেন। তার ওপরই চিরকালের জন্য আঁকা হবে এই অপূর্ব মানচিত্রটি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আরবীয় পণ্ডিতদের মতে পৃথিবী চেপ্টা, তবে যোদ্ধার ঢালের মতো গোল।

রাজার মুখের কথাই আইন। কাজে লেগে গেল প্রথমে ঢালাই কারিগরেরা তারপর স্বর্ণকারেরা। অবশেষে চারজন লোক ধরাধরি করে ভারী রুপোর পাতটাকে কষ্টেসৃষ্টে ভৌগোলিকের কাজের ঘরে নিয়ে গেল। এর পর থেকে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আবু আবদাল্লা মহম্মদ ইব্ন ইদ্রিসি মহামূল্যবান ধাতুর ওপর এ'কে, খোদাই করে, মুদ্রাঙ্কনপ্রণালীর সাহায্যে চাপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন তাঁর এবং রাজা রজারের জানা দেশ ও ভূখণ্ডের দেহরেখা।

মানচিত্র শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু রাজা মারা গেলেন। কিন্তু আরবীয় ভৌগোলিক কাজটা শেষ করে ছাড়লেন। যেমন ভাবা গিয়েছিল মানচিত্র তেমনি দাঁড়াল। বিশাল পাতের ওপর রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন দেশের সাগর-মহাসাগর, নদনদী, পাহাড়পর্বত ও মরুভূমি, আর দীর্ঘ পাকানো কাগজে সুন্দর করে লেখা হয়েছে মানচিত্রের ব্যাখ্যা।

রাজা এবং ভৌগোলিক দুজনে কিন্তু কেবল একটাই ভুল করেছিলেন। দেখা গেল, রুপো মোটেই দীর্ঘস্থায়ী ধাতু নয়। অচিরেই রাজার উত্তরাধিকারীদের টাকাপয়সার অভাব দেখা দিল, রুপোর মানচিত্রও সঙ্গে সঙ্গে লোপাট হয়ে গেল। ইব্ন ইদ্রিসি যদি সাধারণ কাগজের ওপর এর প্রতিলিপি এ'কে রেখে না দিতেন, তাহলে এই মানচিত্র সম্পর্কে কিছুই আমরা জানতে পারতাম না। তাঁর আঁকা প্রতিলিপিগুলি বহু বছর বিশ্বস্তভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সেবা করেছে, এমন কি আজও টিকে আছে। তাহলেই বোঝ, রুপো না কাগজ — কোন্‌টা বেশি টেকসই?

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবী সম্পর্কে শেষতম যা যা তথ্য জানা ছিল, আরবীয় ভৌগোলিকের মানচিত্রে সেসবের সমাবেশ দেখা যায়। এটা অবশ্য ঠিক যে, পৃথিবীর সঙ্গে লোকের তখনও তেমন একটা ভালোমতো পরিচয় ছিল না, আর যেটুকু লোকে জানত না সেটুকু কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিত। এই কারণে ইব্ন ইদ্রিসি ও দ্বিতীয় রজারের মানচিত্রে এমন সমস্ত জিনিস দেখতে পাওয়া যায় বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই, ছিলও না। কিন্তু এই গলদ হল একালের দৃষ্টিতে, আজ থেকে আট শতাব্দী আগে এই মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা কারও ছিল না।

এই পৃষ্ঠায় যে ছবিটা আঁকা আছে সেই দিকে চেয়ে দেখ। ছবিটা এ'কেছেন সন্ন্যাসীরা, বিশেষ করে ঘরকুনোদের জন্য, তাদের জন্য, যারা ভ্রমণ করতে ভালোবাসে না, যাদের বেশি পছন্দ হল ঘরে বসে পানাহার করা আর মিথ্যেবাদী ও হামবড়া মুসাফিরদের যত রাজ্যের গাঁজাখুরি বানানো গল্প শোনা। এ ধরনের ঘরকুনোদের মুখ চেয়েই হরেক রকমের আষাঢ়ে গল্প সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীরা একটা মানচিত্র বানালেন। সে মানচিত্র এমনই যে তার দিকে তাকালে দূরদেশে যাত্রা করার আগে অতি দুঃসাহসী লোককেও রীতিমতো চিন্তা করতে হবে।

যেমন ধর, আঁকা আছে একঠেঙে লোকের ছবি। তোমরা ভাবছ বুঝি খোঁড়া? মোটেই না। আসলে কোন এক পর্যটক
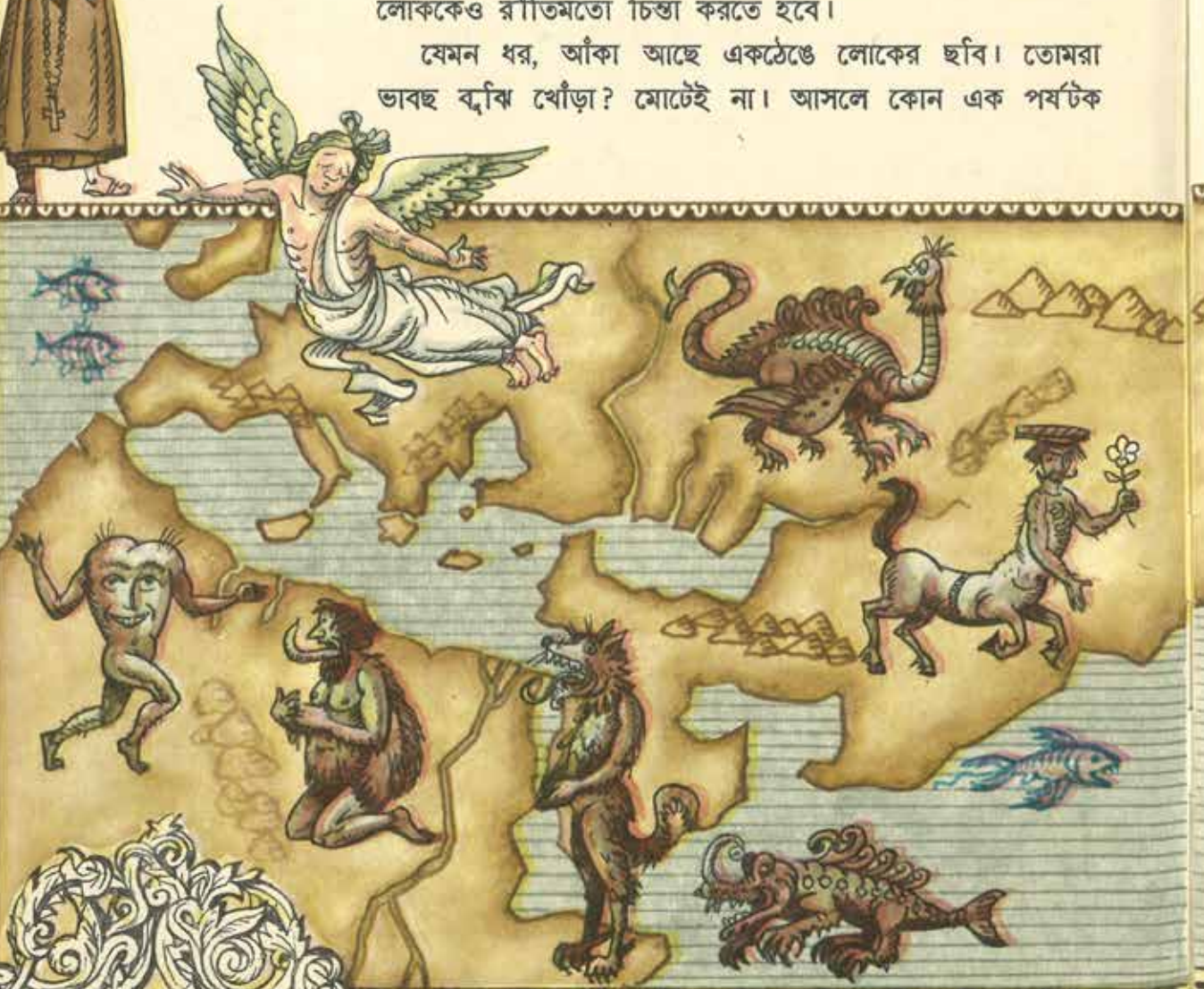
সন্ন্যাসীদের কাছে বলেছিল যে দূর ভারতবর্ষের কোথাও একঠেঙে লোকদের পুরো একটা গোষ্ঠী আছে, তারা খুব দ্রুত দৌড়ুতে পারে। আর যখন বৃষ্টি শুরু হয় তখন তারা মাথার ওপরে পা তুলে দিয়ে পায়ের পাতাকে ছাতা হিশেবে ব্যবহার করে।

ধাপ্পাবাজদের বিবরণ অনুযায়ী, ঐ ভারতবর্ষেই বাস করে এমন এক জাতের মানুষ যাদের মাথা কুকুরের, পাজোড়া ঘোড়ার, এমন কি এতই হতভাগ্য অনাসৃষ্টি যাদের মুখবিবর নেই। পরম ঐশ্বর্যময়ী গঙ্গার তীরে ঘুরে ঘুরে এই মুখবিবরহীন লোকেরা কেবল ঘ্রাণভোজন করে বেঁচে থাকে। আর যখন ভ্রমণে বেরোয় তখন গাত্রবস্ত্রের নীচে রাখে একটিমাত্র বুনো ফল, যার সুবাস বহু দিন থেকে যায়।

আফ্রিকাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসীরা স্রেফ মুণ্ডহীন কবন্ধ লোকজনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের চোখ, কান আর নাক নাকি বুকের ওপর।

মানচিত্রে দৈত্যদানবদের চিত্রও আছে। তাদের কান এত বিশাল আকারের যে কম্বলের মতো করে গায়ে জড়ানো চলে। যে লোকটা নীচের ঠোঁট দিয়ে সূর্যের আলো থেকে মুখ আড়াল করছে সে হল বিশালোষ্ঠ গোষ্ঠীর লোক।

সময় সময় মধ্যযুগীয় শিক্ষিত লোকজনের বইপুথির মধ্যে দার্শনিকদের লেখা এমন সমস্ত রচনার অনুবাদও দেখা যেত যেখানে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, যত বেশি সময় যেতে লাগল মানুষ ততই বেশি করে নানা তথ্যাদি সঞ্চয় করতে লাগল। পৃথিবী যে চেপ্‌টা এই মর্মে পবিত্র লিখনে যে রূপকথা ফাঁদা হয়েছে, অবিসংবাদিত ঘটনাগুলি তার প্রবল বিরুদ্ধাচারী হয়ে দেখা দিল।

আর তারপর যা ঘটল তাতে পৃথিবী যে চেপ্‌টা থালার মতো, এই ধারণা চিরকালের জন্য সরে গিয়ে উপকথার জগতে আশ্রয় নিল। আমাদের গ্রহ শেষ পর্যন্ত আবার গোলক রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৫১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরগামী গুয়াডালকুইভির নদীর মোহানা থেকে বেরিয়ে পাঁচটি স্পেনীয় জাহাজ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে, ব্রাজিলের উপকূল অভিমুখে যাত্রা করল। 'ত্রিনিদাদ' নামে এই ফ্ল্যাগশিপটি যাত্রা করল অভিযানের কম্যান্ডার ফার্দিনান্দ ম্যাগেলানের নেতৃত্বে। স্পেনের রাজাকে তিনি কথা দেন যে পশ্চিমের পথ দিয়ে তিনি পূবে অবস্থিত মালাক্কা বা মশলাদ্বীপপুঞ্জে পৌঁছুবেন।

তিন বছর বাদে, ১৫২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, 'ভিক্টোরিয়া' নামে নৌবহরের একমাত্র যে জাহাজটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, প্রাক্তন কর্ণধার জুয়ান সেবাস্তিয়ান দে এল্‌কানোর নেতৃত্বে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সেটি ফের এসে পড়ল গুয়াডালকুইভিরের মোহানায়। এই ভাবে সম্পন্ন হল মানবেতিহাসে প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ, আর তাতেই চিরতরে প্রমাণিত হয়ে গেল যে পৃথিবী গোল!

প্রথম আমলের ভ্রমণকারীদের জাহাজ যতক্ষণ অন্তর্বর্তী সমুদ্রের মধ্যে যাতায়াত করছে অথবা উপকূল থেকে তেমন একটা দূরে যেতে ভরসা পাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর আকার কেমন এই নিয়ে ক্যাপ্টেনদের মাথা ঘামানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্বদেশের তীরভূমি থেকে তারা যত দূরে সরতে থাকে ততই ভূপৃষ্ঠের আকারের কথা বিবেচনা না করে যে সমস্ত মানচিত্র রচিত, সেগুলির, অর্থাৎ পুরনো মানচিত্রগুলির, ভুলত্রুটি আরও বেশি করে সংশোধন করতে হয় নাবিকদের।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুরু হল বড় বড় ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ। উপকূলভাগ ছেড়ে পালতোলা জাহাজ মহাসাগরের বুক ভেদ করে যাত্রা করল। এটা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের দুঃসাহসী উদ্যোগ। কেন, তা তোমরা এখনই বুঝতে পারবে।

আজকের দিনে যে-কোন দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা জানে যে পৃথিবীর যে-কোন জায়গার অবস্থান অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ — এই দুই স্থানাঙ্কের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের দূরত্ব, অর্থাৎ দ্রাঘিমাংশ হিসাব করা হয় শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রী ধরে। আমরা বিশেষ করে এখানে ছবি এঁকে দিয়েছি যাতে সহজেই তোমাদের একটা চাক্ষুষ ধারণা হয়।

১৫২২

রাতের আকাশে ধ্রুবতারা অথবা দুপুরবেলায় সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা দেখে অক্ষাংশ সহজেই নির্ণয় করা যায়। অনেককাল থেকেই এর জন্য নাবিকদের মধ্যে কোণ মাপার বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির চল ছিল। সেগুলির নাম সেক্সট্যান্ট, অ্যাস্ট্রলেব্ ও কোয়াড্রান্ট। এই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে খোলা সমুদ্রে সরাসরি জাহাজের ডেকের ওপর থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কতটা উঁচুতে আছে মাপা সম্ভব হত।

দ্রাঘিমাংশের ব্যাপারটা অবশ্য জটিলতর। দ্রাঘিমাংশ বলতে বোঝায় তুমি আমি যেখানে অবস্থান করছি সেই বিন্দুর মধ্যতল এবং শূন্যরূপে ধার্য মধ্যরেখার তলের অন্তর্বর্তী কোণ। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের গ্রিনীচ মানমন্দিরের ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা গেছে তাকেই প্রাথমিক বা শূন্য ডিগ্রী মধ্যরেখা ধরা হয়।

প্রাথমিক মধ্যরেখা ভূমণ্ডলকে ভাগ করেছে পূর্ব ও পশ্চিম — এই দুই গোলার্ধে, আর বিষুবরেখার বৃত্ত তাকে ভাগ করেছে প্রতিটি গোলার্ধকে ১৮০ ডিগ্রী করে দুটি অর্ধে। (তোমরা নিশ্চয়ই জান যে একটা পুরো বৃত্ত হয় ৩৬০ ডিগ্রী।) পুবের দিকে শূন্য থেকে ১৮০ ডিগ্রী মধ্যরেখাকে বলা হয় পূর্ব দ্রাঘিমাংশ আর পশ্চিমের দিকে শূন্য থেকে ১৮০ ডিগ্রী — পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। আঁকা ছবিটার দিকে তাকালে এটাও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু খোলা সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা যায় কী ভাবে? কয়েক শতাব্দী ধরে এটা কেউ বার করতে পারে নি। এই কারণে প্রথম আমলে দূর সমুদ্রযাত্রায় বেরোবার সময় জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা হত কেবল অক্ষাংশ দিয়ে।

ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান
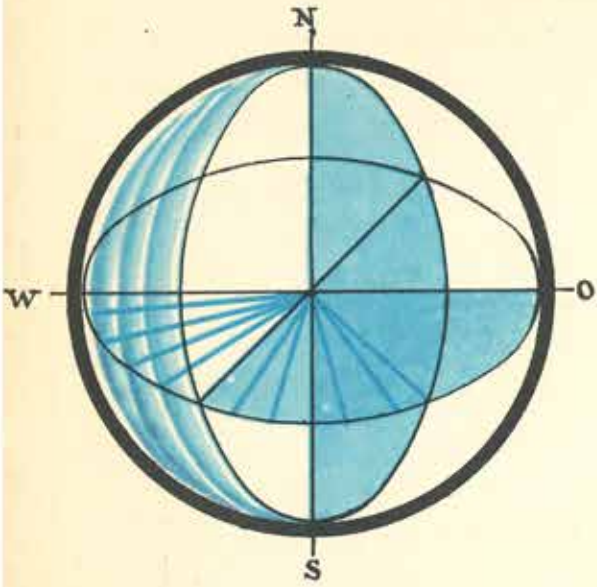
সেই সময় কর্ণধার আর ক্যাপ্টেনরা যে ভাবে জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করত তা লক্ষ করার মতো। ধরা যাক, পর্তুগালের উপকূলভাগ থেকে কোন জাহাজকে মহাসাগরের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন দ্বীপের দিকে যেতে হবে। সবচেয়ে আগে ক্যাপ্টেনকে জেনে নিতে হবে গন্তব্যস্থলের অক্ষরেখার মধ্যাহ্নসূর্য কতটা উঁচুতে আছে। এর পর সে জাহাজ মহাসাগরের ভেতরে চালিয়ে এনে দক্ষিণে ঘোরাল। কম্পাসের কাঁটায় কাঁটায় জাহাজ চলতে লাগল যতক্ষণ না মধ্যাহ্নে সূর্য যথাযোগ্য উচ্চতায় এসে পৌঁছুল। তখন ক্যাপ্টেন নব্বই ডিগ্রী পশ্চিমে জাহাজের মোড় ঘুরানোর আদেশ দিলেন, এই ভাবে দিনমণি সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা দেখে নিজেদের অবস্থান বুঝে অক্ষরেখা ধরে চলতে চলতে জাহাজ সোজা দ্বীপে এসে পৌঁছুল।
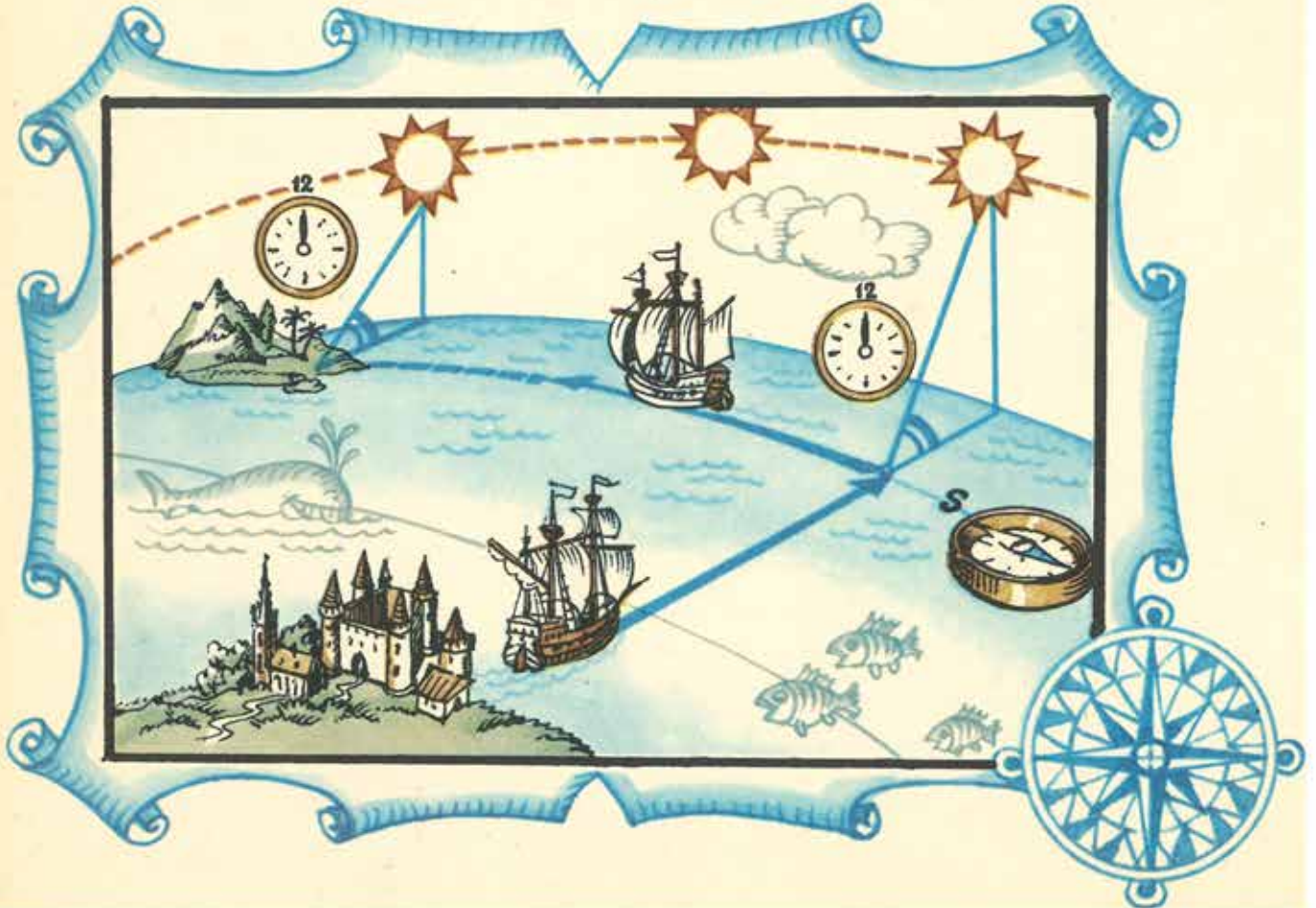
তোমাদের মধ্যে যারা দাবাখেলা জানে তারা সম্ভবত খেয়াল করেছে যে সমুদ্রযাত্রার এই পদ্ধতিটা অনেকটা দাবার ঘোড়ার চালের মতো। স্বীকার করতেই হবে, সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পক্ষে পদ্ধতিটা তেমন প্রশস্ত নয়।

এই ভাবে নৌচলাচল নির্ভরযোগ্য নয় দেখে বহু দেশের সরকার নানা ধরনের বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন, খোলা সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণের সমস্যাপূরণের জন্য বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলি দেখা গেল হয় রীতিমতো জটিল, নয়ত সামান্যই নিখুঁত।

কেবল ক্রনমিটার উদ্ভাবনের পরই এই সমস্যার সমাধান ঘটল। ক্রনমিটার হল জাহাজের নিখুঁত ঘড়ি, যার সাহায্যে আগাগোড়া সমুদ্রযাত্রাকালে প্রাথমিক বা শূন্য ডিগ্রী মধ্যরেখার সময় 'বজায় রাখা' যায়। তাহলে প্রাথমিক সময় অর্থাৎ গ্রিনীচ সময় ও স্থানীয় সময়ের মধ্যকার ব্যবধান দিয়ে ক্যাপ্টেনের পক্ষে দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করা সম্ভব। আর স্থানীয় সময়, অন্তত মধ্যাহ্নে ত বটেই, লোকে স্মরণাতীতকাল থেকে এবং ভূমণ্ডলের যে কোন জায়গায় বার করতে জানত।

স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা একটা আংশিক সমস্যা। কিন্তু সামগ্রিক সমস্যার সমাধান— গোলাকার ভূপৃষ্ঠকে সমতল মানচিত্রে ফুটিয়ে তোলা কী ভাবে সম্ভব? কাগজের ওপরে কী ভাবে আঁকা যায় ভূমণ্ডলের হুবহু মানচিত্র?

একটা বেলুন বা বল্-এর আবরণ সমতল টেবিলের ওপর বিছানোর চেষ্টা করেই দেখ না। আর হ্যাঁ, এমন ভাবে বিছাতে হবে যাতে পুরোপুরি গায়ে গায়ে টেবিলের সমতলে আঁটসাঁট হয়ে লেপ্টে থাকে। অনেক রকম কসরত করার পর তোমরা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে এর উপায় একটাই — গোল আবরণটাকে কয়েক খণ্ড করে কাটতে হবে। আর এই খণ্ডগুলি যত সরু হবে তত ভালো করে টেবিলের গায়ে লাগবে।

কিন্তু সিমাইয়ের মতন অমন ফালা ফালা মানচিত্র দিয়ে কার কী হবে? ওটা কিসের কাজে লাগবে? অথচ অমন মানচিত্র ছিল। যেন কোন গোলক থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ফালি ফালি গোঁজের ওপর সেই মানচিত্র আঁকা। ভূপৃষ্ঠ ফুটিয়ে তোলার অন্যান্য উপায়ও চেষ্টা করে দেখা হয়। দেখতে দেখতে সৃষ্ট হল ভৌগোলিক মানচিত্র সংক্রান্ত এক আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান — মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা। আর যেহেতু সমতলক্ষেত্রে গোলকের পিঠের প্রতিরূপ কোনমতেই আনা সম্ভব নয় সেই হেতু বিজ্ঞানীরা মানচিত্রের নানা ধরনের অসংখ্য অভিক্ষেপ ভেবে বার করলেন। সেগুলির কোন কোনটিতে বিষুবরেখার মাঝখান বরাবর দৈর্ঘ্য বজায় রইল, কিন্তু রেখাগুলি সেখান থেকে দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈর্ঘ্যেরও বিকৃতি ঘটতে লাগল। কতকগুলিতে দ্রাঘিমা বরাবর দৈর্ঘ্য ঠিকই রইল, কিন্তু মহাদেশগুলির আকার ও আয়তনের বিকৃতি ঘটল। আবার কোন কোনটিতে মানচিত্রে মহাদেশগুলির আয়তন যাতে তাদের বাস্তব মূল্যের সমানুপাতিক হয়ে প্রকাশ পায় সে চেষ্টাও করা হয়। কোন কোনটিতে বা... কিন্তু এরকম আরও অনেক অনেক উল্লেখ করা যায়।

আমাদের ছবিগ্‌লিতে এই রকম কয়েকটি ভৌগোলিক অভিক্ষেপের পরিচয় পাবে। মন দিয়ে দেখ। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত ভবিষ্যতে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে, তখন কিন্তু এগ্‌লির কোন একটার কথা তাকে মনে করতে হবে। একটাই বা বলি কেন, হয়ত বা একাধিকই।

প্রথম পরিচ্ছেদ
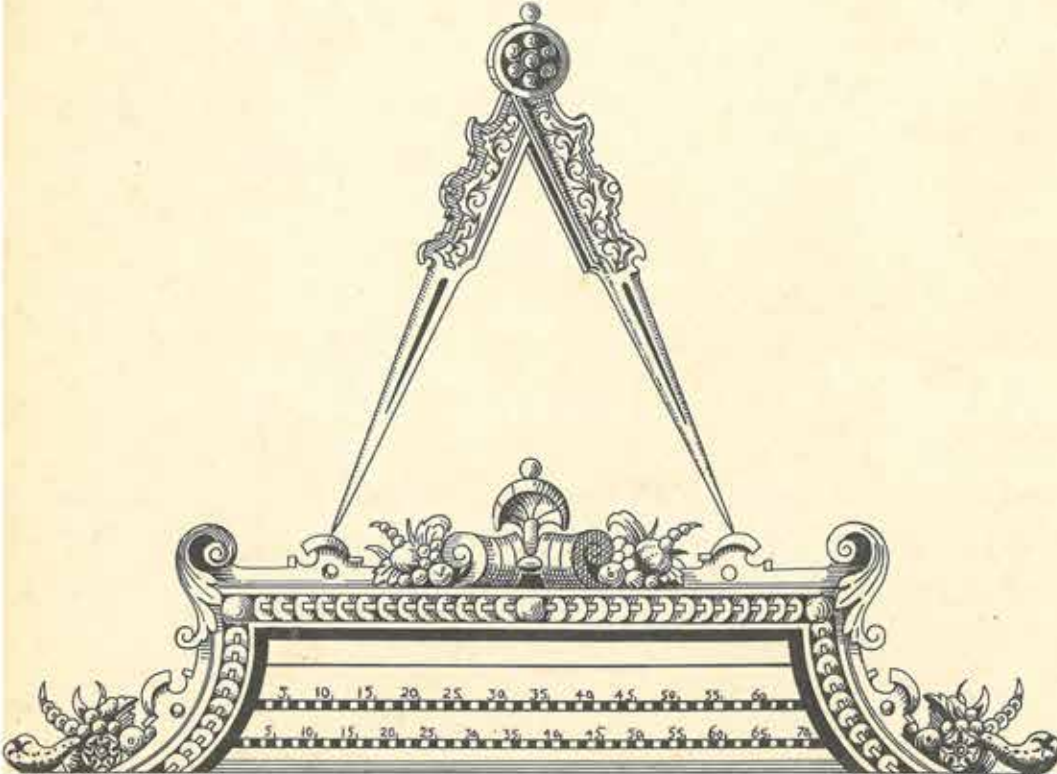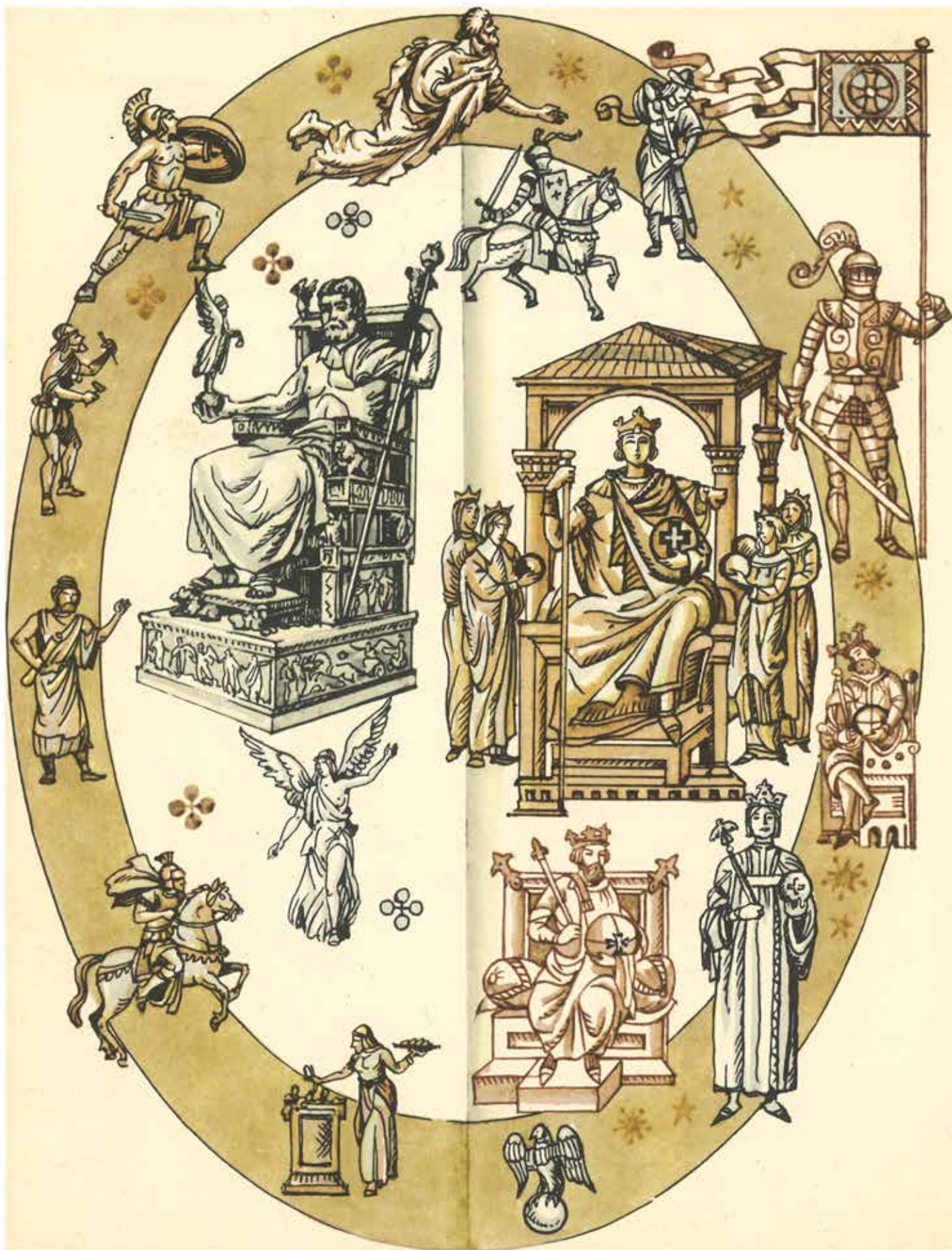
মানচিত্র থেকে ভূগোলক
একটি ভূগোলকের কাহিনী

অনেক অনেক আগে, খ্রীষ্টজন্মের দেড়শ বছর আগে প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত মাল্লুসের দার্শনিক ক্রাটেস্ গোলকের আকারে পৃথিবীর এক প্রতিরূপ তৈরি করেন। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তিনি ছিলেন অ্যারিস্টট্‌লের অনুগামী এবং তাঁর একজন প্রশিষ্য। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিরূপটি রক্ষা পায় নি। কিন্তু যাঁরা ওটা দেখেছিলেন তাঁরা বলেন যে ক্রাটেস্ গোলকের গায়ে একটিমাত্র স্থলভাগ এঁকে নদনদীর প্রবাহ দিয়ে সেটাকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করেন। ঐ নদনদীগুলিকে তিনি উল্লেখ করেন মহাসাগর নামে।

এই প্রতিরূপটিকে আজ অবশ্য সত্যিকারের ভূগোলক বলা কঠিন। অর্থাৎ, সেই সময়কার মানুষের পরিচিত সমস্ত মহাদেশ আর সাগর-মহাসাগর সমেত পৃথিবীর হুবহু প্রতিরূপ একে বলা যায় না। এটা সম্ভবত ছিল পৃথিবীর প্রতীকমাত্র। যদিও পরবর্তীকালে লোকে আবার চেপ্টা পৃথিবীর তত্ত্বে ফিরে যায় তবু রোমক ও বাইজানটাইন সম্রাটরা জগতের উপর রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক হিশেবে ক্রাটেসের ঐ সাগর-মহাসাগর বিদীর্ণ ভূখণ্ড-আঁকা গোলক প্রথম গ্রহণ করেন। কেবল পৌত্তলিক রোমকদের বেলায় গোলকের মাথার ওপর শোভা পেত বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি আর বাইজানটাইন খ্রীষ্টানদের বেলায় — ক্রুশচিহ্ন। এর পর থেকে এই প্রতীকটি রাজকীয় ক্ষমতার অপরিহার্য চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়। এখন এই রাজচিহ্নগুলি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় মিউজিয়মগুলিতে শিল্পনিদর্শন ও মহামূল্যবান সামগ্রীরূপে সংরক্ষিত হয়ে আসছে, কেননা সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এগুলি সোনা দিয়ে তৈরি করেন, দামী পাথরে অলঙ্কৃত করেন।

প্রথম খাঁটি গোলকের আবির্ভাব ঘটে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একবার প্রাচীন জার্মান শহর নুরেনবার্গে স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ীর ছেলে মার্টিন বেহাইম তাঁর বাবাকে দেখতে এলেন। বাপমায়ের বড় দুঃখ এই যে ছেলে তার বাপের ব্যবসায় গেল না। কোথায় নিশ্চিন্তে

ব্যবসা করবেন, তা না মার্টিন সমুদ্রযাত্রী হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গণিতবিদ্যা অধ্যয়নের পর তিনি অভিজ্ঞ নাবিক হয়ে পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জুয়ানের রাজকর্মচারীর কাজে যোগ দেন। এখানে তিনি পর্তুগালের প্রধান কর্ণধার হন। রাজা তাঁকে অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত করেন, নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

সদ্য আভিজাত্যলব্ধ এই ব্যক্তিটির কিছুদিন বাদে জন্মস্থান দর্শনের বাসনা হল। উদ্দেশ্যটা হল জন্মভূমি থেকে বহু দূর দেশে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মহলে তা জাহির করা।

নুরেনবার্গের লোকেরা হাঁ-করে পরম শ্রদ্ধাভরে শুনল মার্টিনের 'এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী' ভ্রমণের কাহিনী। তাদের অধিকাংশের মনেই এ প্রশ্নের উদয় হয় নি যে পৃথিবী গোল। দেশের লোকেরা দূর দূর দেশযাত্রায় তিনি যা যা দেখেছেন স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে তার ছবি এ'কে দেবার জন্য মার্টিনকে ধরে বসল।

মার্টিন রাজী হয়ে গেলেন। এক ফুট আট ইঞ্চি ব্যাসের একটি কাঠের গোলক বানিয়ে তার ওপর তুলট কাগজ লাগিয়ে আনতে বললেন। তারপর তিনি যা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন সে সমস্তই ওটার ওপর এ'কে ছবিগুলির নীচে কিছু কিছু লেখাও লিখে দিলেন। এ কাজটা না করলেই বোধহয় ভালো করতেন! ভূগোলকের ওপরে কালো ও লাল কালিতে এত বেশি আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে যে কিছুকাল বাদে দেখা গেল ন্যুরেনবার্গের লোকেরাই আর ঐ উপহার নিয়ে গর্ব করছে না, বরং জনসমক্ষে ওটা দেখাতে লজ্জাই পাচ্ছে। সর্বজনবিদিত জায়গাগুলির অক্ষাংশের ক্ষেত্রে মার্টিন বেহাইমের গোলকে এমন সমস্ত ভুল ছিল যা অতি সাধারণ মানচিত্রেও দেখা যায় না। আর দূর দূর দেশগুলি যে ভাবে দেখানো হয়েছিল তাতে মানচিত্রটাকে একেবারেই ছে'দো বলতে হয়।

যেমন, যেখানে আমেরিকা থাকার কথা সেই জায়গায় মার্টিন বেহাইম পুরো একটা দ্বীপপুঞ্জ এ'কে লিখে রেখেছেন যে সেখানে অতি বিশাল বিশাল দৈত্যাকার লোকজনের বাস — তাদের প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের চেয়ে দৈর্ঘ্যে চারগুণ এমন কি পাঁচগুণ বড়। এরা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের বিরাট বিরাট লম্বা লম্বা কান, চওড়া মুখবিবর, বড় বড় ভয়ঙ্কর চোখ, আর তাদের হাত যে কোন লোকের হাতের চেয়ে চারগুণ বড়।

যবদ্বীপে লেজওয়ালা লোকজনের বাস বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। জাপানে, যাকে তিনি জিপাংগো দেশ বলেছেন সেখানে, তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, বহু সমুদ্রদানব, সমুদ্রডাকিনী ও বিকটধরনের সমস্ত মাছের বাস।

কিন্তু তাহলে কী হবে, 'ভূমণ্ডলীয় আপেল' নামে পরিচিত তাঁর ভূগোলকে রঙচঙের খুবই ঘটা ছিল। প্রতিটি রাজ্যে আঁকা ছিল সিংহাসনারূঢ় নৃপতি, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রঙবেরঙের প্রতীকচিহ্ন, উড়ছে পতাকা। দক্ষিণ গোলার্ধ সেকালে পর্যটকদের কাছে অপরিচিত ছিল বললেই চলে। ঐ গোলার্ধের গায়ে মার্টিন তাঁর গোলক সৃষ্টির ইতিহাস লিখে রেখেছেন।

মার্টিন বেহাইমের পর অন্যান্য দেশেও অসংখ্য ভূগোলক তৈরি হয়। সেগুলি ছিল ব্যয়বহুল, বিশালাকার, তাদের সাহায্যে পথ খু'জে পাওয়াও সুবিধাজনক নয়। তবে হ্যাঁ, নাবিকদের নৌবিদ্যা শিক্ষার পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কিছু ভাবা যায় না। এই কারণে বহু কারিগর ভূমণ্ডলের নতুন নতুন প্রতিরূপ গড়ার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। সেগুলির মধ্যে অনন্যসাধারণও কিছু ছিল। এই রকম একটি ভূগোলকের কাহিনীই আমি তোমাদের বলতে চাই।

প্রাচীনকালের মানচিত্র

একটি ভূগোলকের কাহিনী
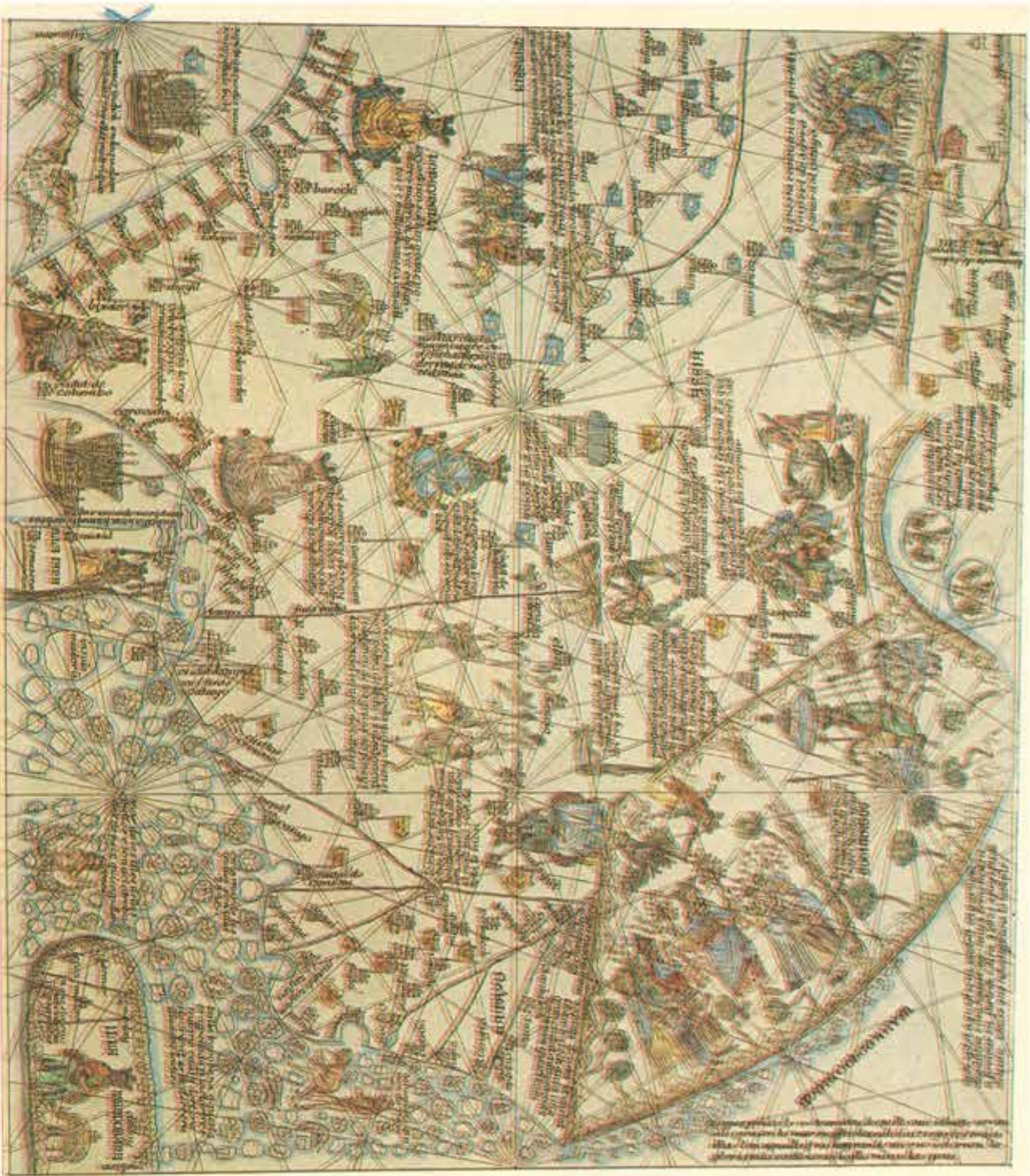
সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদে নেভা নদীর তীরে মিনারসমেত একটি প্রাচীন দালান আছে। এটা হল প্রথম রুশ মিউজিয়ম। এখানে, মিনারের পাঁচতলায় সংরক্ষিত আছে এক বিশাল ভূগোলক। এরই যে বিশদ ইতিহাস লেনিনগ্রাদের বিজ্ঞানী, অধ্যাপক রুডল্ফ ইট্স দিয়েছেন, তা তোমাদের বলতে চাই।

...১৭১৩ সালের শরৎকালের এক সন্ধ্যায় জার্মান ডিউক-রাজ্য শ্লেস্ভিগ্-হল্ষ্টিনের হট্টর্প্ দুর্গের জানলাগুলি উজ্জ্বল আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। শ্লেই নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপে নির্মিত এই দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গটি সুইডিশ সেনাবাহিনী অবরোধ করে। ডিউক-রাজ্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে রুশ সেনাবাহিনী। অবরুদ্ধদের সঙ্গে মিলে তারা সুইডদের বিতাড়ন করল। এই উপলক্ষে নাবালক ডিউকের অভিভাবক এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করেন। চতুর রাজপ্রতিনিধিটি জানতেন যে রুশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেটও ছিলেন।

নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি পিটারের প্রবল আগ্রহ আছে জেনে ডিউকের অভিভাবক তাঁকে একের পর এক হলঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সংগ্রহ দেখাতে লাগলেন। জার এই সব দেখে অবাক হয়ে গেলেও কোথাও না থেমে দ্রুত পা চালিয়ে চললেন। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস দেখে তিনি থমকে গেলেন। আধা অন্ধকার বড় ঘরের মধ্যে দাঁড়
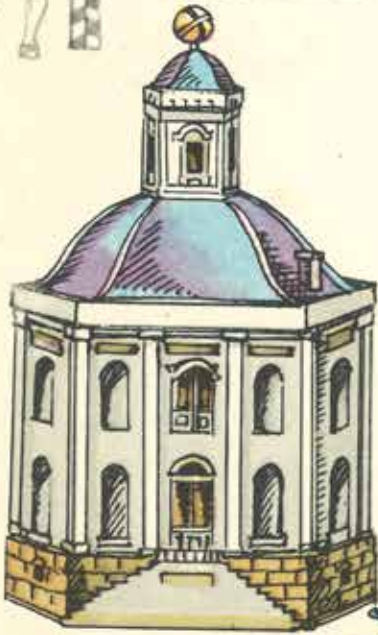
করানো আছে এক বিশাল ভূগোলক, তিন মিটারেরও বেশি তার ব্যাস। গোলকটা কাঠের তৈরি, তার গায়ে কাগজ লাগানো। কাগজের ওপর নানা রঙে আঁকা রয়েছে তৎকালীন ইউরোপে পরিচিত সমস্ত দ্বীপ আর মহাদেশ।

পিটার আরও অবাক হয়ে গেলেন যখন গৃহস্বামী পাশের একটা ছোট্ট দরজা খুলে অতিথিকে গোলকের ভেতরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে ছিল একটা টেবিল, টেবিলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে গোলকের অক্ষদণ্ড, আর চারপাশ ঘিরে একটা বেঞ্চি। লাল টকটকে রঙ লাগানো দেয়ালের গায়ে পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল তামার তৈরি তারা।

গোলকটা জারের খুবই মনে ধরল। আর যখন রাজপ্রতিনিধির ইঙ্গিতে গোটা মেশিনটা পৃথিবীর মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল তখন পিটার একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেশে এর সাহায্যে রুশ নাবিকদের নৌবিদ্যা শেখানোর জন্য এই আশ্চর্য জিনিসটা পেতে বড় ইচ্ছে হল তাঁর। আর এই কারণে কয়েক দিন বাদে সুইডিশ অবরোধের কবল থেকে রাজ্য উদ্ধারের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গোলকটা উপহার পেয়ে তিনি যে কী খুশিই হয়েছিলেন তা তোমরা বুঝতে পারছ।

শুরু হয়ে গেল রুশদেশের রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গের উদ্দেশ্যে জার্মান আশ্চর্যের দীর্ঘ ও কঠিন পথযাত্রা। সময় লাগল চার বছর। প্রথমে গোলকটা

সমুদ্রপথে জাহাজে করে গেল, তারপর ওটাকে বিশাল স্লেজের ওপর চাপিয়ে বনজঙ্গল কেটে পথ বানিয়ে, জলাভূমি আর খাতের পাশ কাটিয়ে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাওয়া হল। ডিউক-রাজ্যের আশ্চর্য বস্তুটি অবশেষে রাজধানীতে এসে পৌঁছুলে সেটাকে এক বিশেষভাবে তৈরি কুঠুরিতে রাখা হল।

পরবর্তীকালে একমাত্র পিটারের মৃত্যুর পরই যাদুঘর তৈরি হলে তার মিনারে ভূগোলকটি রাখা হয়। বিশ বছর পরে বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডের ফলে যাদুঘরের সংগ্রহের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হয়ে যায়। জার্মান গোলকটিও আগুনে পুড়ে যায়।

বহুকাল এমন কোন লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না যে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ঐ আশ্চর্য বস্তুটার সংস্কার করতে পারে। সংস্কার করতে সমর্থ হলেন রুশ কারিগর তিরিউতিন। কিছু সংখ্যক সহকারীর সাহায্যে তিনি গড়ে তুললেন একটা নতুন কাঠামো, ঘোরানোর যন্ত্রব্যবস্থা মেরামত করলেন, তার উৎকর্ষসাধন করলেন। হলুদ রঙের তামার দুটি পাত দিয়ে বিষুবরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মতন
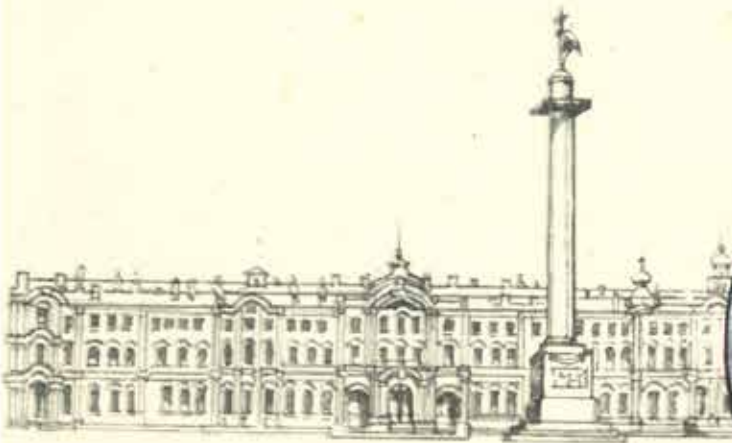
করে গোলকটাকে বেড় দিলেন। তারপর ডাকা হল অঙ্কনশিল্পীদের। এখানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হল, কেননা গত একশ বছরে পৃথিবীতে বেশ কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, সংশোধিত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে।

ভেতরের দেয়ালে লাগানো হল আশমানি রঙ। নক্ষত্রপুঞ্জের রূপকধর্মী ছবি আঁকা হল, আঁটা হল সোনালি তারা দেয়া পেরেক। বেশ হল দেখতে — পুরনোটার থেকেও ভালো।

১৯০১ সালে ভূগোলকটা নিয়ে আসা হল ত্সারস্কোয়ে সেলোতে (বর্তমানে পুশকিন শহর)। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪১-১৯৪৫) শহর সাময়িকভাবে ফাশিস্ত বাহিনী দখল করে ফেলে। সোভিয়েত সৈন্যরা যখন দখলদারদের কবল থেকে পুশকিন শহর উদ্ধার করে তখন না ভূগোলক না তার ধ্বংসাবশেষ কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু খোঁজাখুঁজির পর তার সন্ধান পাওয়া গেল জার্মানির লিউবেক শহরে — ফাশিস্তরা ওটা ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

দুশো বছর আগে যেমন হয়েছিল এবারেও তেমনি গোলকটা — এখন অবশ্য তিরিউঁতিনের গোলক — জাহাজে চাপানো হল। আর্খানগেল্স্ক বন্দরে তার জন্য তৈরি হল এক বিশেষ ধরনের রেলওয়ে পাটাতন, তাতে চেপে আমাদের দায়ে-পড়ে ভ্রমণকারী ভূগোলক ফিরে এলো লেনিনগ্রাদে।

১৯৪৮ সালে যাদুঘরের মিনারের দেয়ালে একটা বিশেষ ধরনের গর্ত করা হল। রুশ কারিগরের তৈরি এই বিশাল ভূগোলকটি ক্রেনের সাহায্যে গিয়ে উঠল পাঁচতলায়। আজও ওটা ওখানেই আছে।

লেনিনগ্রাদে যাবার সুযোগ যদি তোমাদের হয়, তাহলে যাদুঘরে গিয়ে এই পর্যটক ভূগোলকটিকে একবার দেখার অবশ্যই চেষ্টা করবে। আফশোস করতে হবে না!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ষষ্ঠ
পরিচ্ছেদ
পৃথিবীর আয়তন
ফুটি না আপেল — কিসের মতো পৃথিবী?
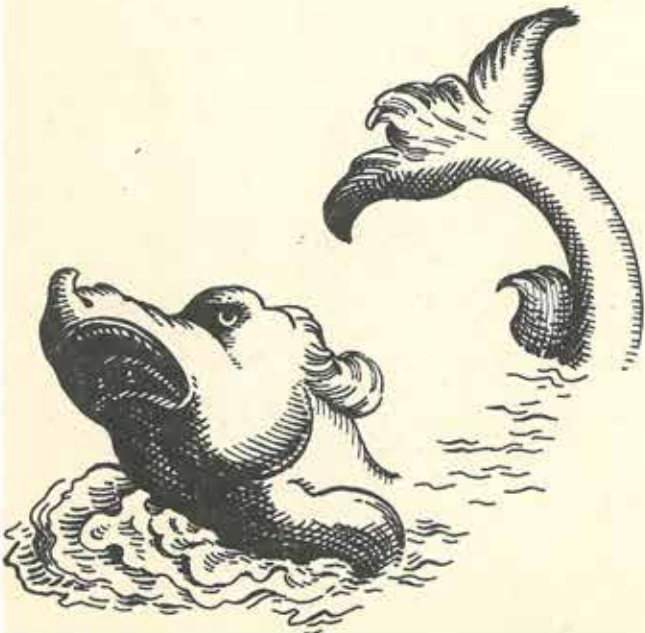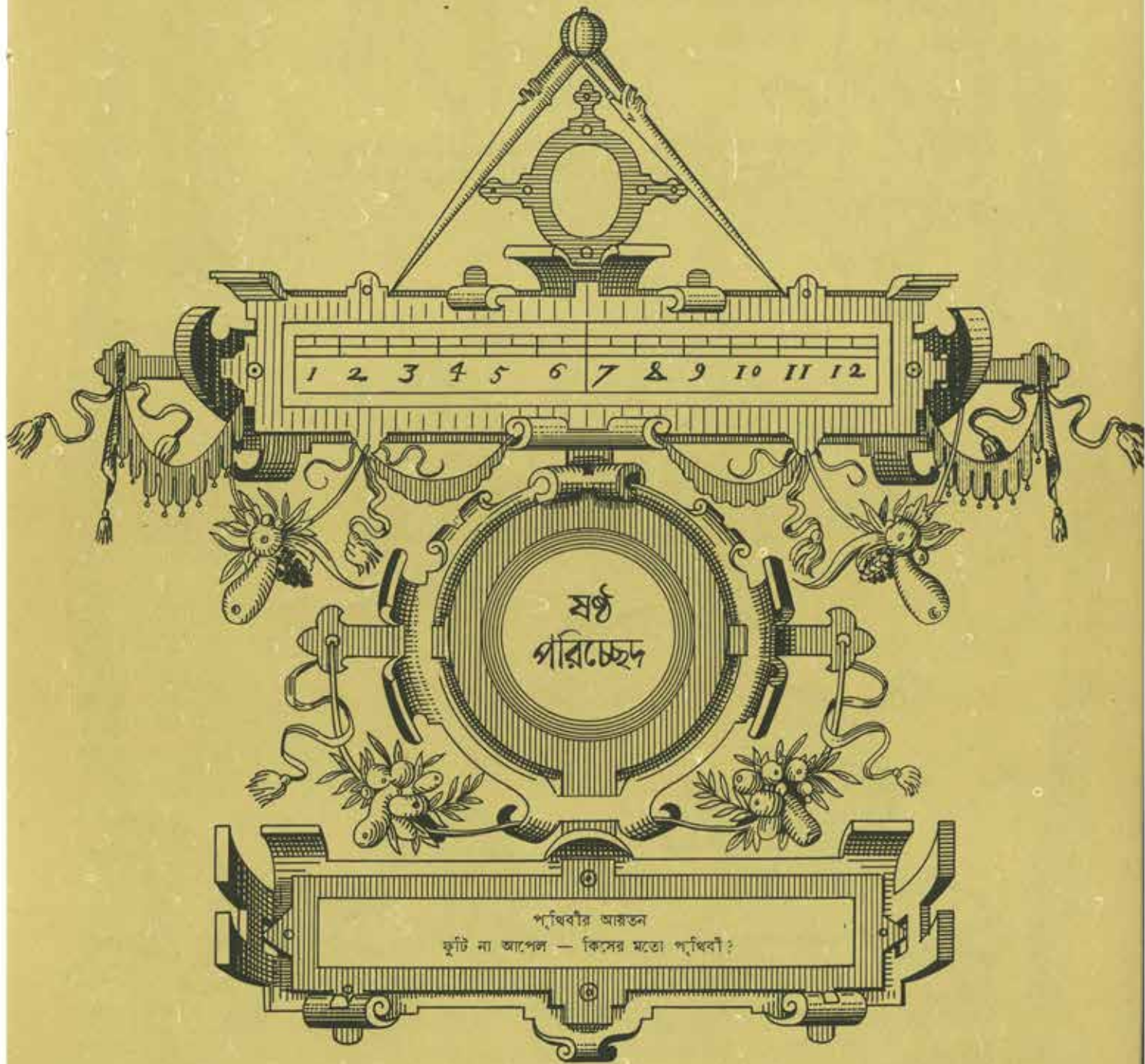
সুপ্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর আকার ও আয়তন জানার জন্য মানুষের আগ্রহ।

এরাতোস্থেনাসের পর বহু পণ্ডিত তাঁর পন্থায় চেষ্টা চালালেন। কিন্তু তাঁদের ফল বেরোল নানা রকমের। রোড্স দ্বীপ আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে জাহাজ যেতে কত দিন লাগে তার হিসাব নিয়ে এবং রাতের আকাশে অগস্ত্য তারা কতটা উঁচুতে থাকে তা নির্ণয় করার পর প্রাচীন গ্রীসের জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ পসিডোনিয়াসও পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর ফল এরাতোস্থেনাসের চেয়ে কম নিখুঁত হল।

তারপর প্রায় হাজার বছর কেটে গেল। নবম শতাব্দীতে খলিফা আল্-মামুনের নির্দেশে আরবীয় পণ্ডিতরা আমাদের গ্রহ পরিমাপ করেন। তাঁরা কাজ করেন মেসোপোটামিয়ায়, কিন্তু তাঁদের হিসাবের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের আরও কিছু কিছু চেষ্টা করা হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ফরাসী চিকিৎসক তাঁর গাড়ির চাকায় ঘূর্ণন গণনার একটি যন্ত্র লাগিয়ে প্যারিস থেকে আমিয়েন্স শহরে যাত্রা করলেন। পথের শুরুতে এবং যাত্রাশেষে তিনি কাঠের ত্রিকোণের সাহায্যে সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা খুঁটিয়ে দেখে তাই দিয়ে পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেন। কিন্তু পথ উঁচু-নীচু এবং আকাশে সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা পরিমাপের পদ্ধতিও স্থূল হওয়ায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। পরিমাপের অন্য কোন পদ্ধতি বার করার প্রয়োজন দেখা দিল। পদ্ধতিটা হতে হবে এমন যাতে জমি উঁচুনীচু হলেও কোন ব্যাঘাত না হয়।

আরও প্রায় একশ বছর পরে উইলেরড স্নেল্ নামে জনৈক ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ অনুরূপ একটি পদ্ধতি দেখান। পদ্ধতিটির নাম তিনি দেন 'ট্রায়াংগুলেশন' — লাতিন ভাষার শব্দ 'ট্রায়াংগুলিয়ম' অর্থাৎ ত্রিকোণ থেকে এর ব্যুৎপত্তি। ওপরের ক্লাসে উঠে তোমরা যখন ত্রিকোণমিতি পড়বে তখন অবশ্যই জানতে পারবে ত্রিকোণের সাহায্যে কী ভাবে ঐরকম পরিমাপ করা যায়। ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক।

বিভিন্ন দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপব্যবস্থার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাতেও বিজ্ঞানীদের কাজে কম ব্যাঘাত ঘটত না। যেমন, ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাত্রা ছিল তুয়াজ — ছয় ফুটের সমান।

ঐ একই সময় ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল গজ — তিন ফুটের সমান। আর রাশিয়ায় সাজেন — ইংলণ্ডীয় সাত ফুট।

আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিতে ফুটের আয়তনই হত একেক রাজ্যে একেক রকমের। এছাড়া আবার ছিল মাইল — ইংলণ্ডীয় ও মার্কিন, সামুদ্রিক

মাইল ও স্থলসীমা মাপার মাইল, ছিল রুশী ভার্স্ট।

এসব মিলেমিশে এমন একটা জট পাকিয়ে তুলত যে সবগুলি ব্যবস্থার বদলে একটা সাধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। ফরাসীরা পৃথিবীর মধ্যরেখার এক-চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগকে দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাত্রা হিশেবে গ্রহণের প্রস্তাব দিল। ফরাসীদেশের জাতীয় পরিষদ এই প্রস্তাব আইনে পরিণত করল। নতুন মাত্রার নাম হল মিটার।
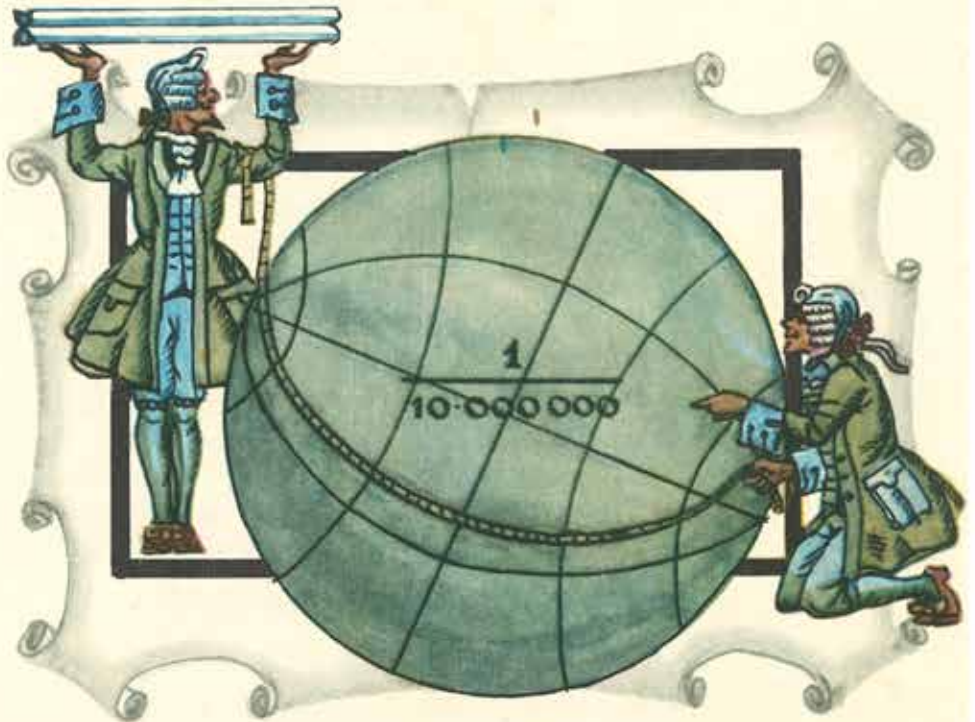
ফুটি না আপেল — কিসের মতো পৃথিবী?

আপেলের সঙ্গে ফুটির তফাতটা কোথায় তোমরা কি জান? স্বাদের কথা অবশ্য বলছি না, বলছি আকারের কথা। ফুটি সামনে আর পেছনের দিকে খানিকটা টানা, লম্বাটে, আর আপেল ঐ দুদিকেই একটু চাপা। এসো, এরকমই ধরা যাক, যদিও প্রকৃতিতে নানা বেয়াড়া আকারের ফুটি এবং আপেলও দেখা যায়।

পৃথিবী যে একটা আদর্শ গোলক সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু পরে হঠাৎ দেখা গেল সন্দেহ। পৃথিবীর বিভিন্ন বিন্দুতে দ্রাঘিমার ধনুরেখাগুলির দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমি এই সিদ্ধান্তে এলো যে আমাদের গ্রহ দুই মেরুর দিকে সামান্য টানা, লম্বাটে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকার ফুটির মতো। এখান থেকে এর সূত্রপাত।

ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন এটা মানলেন না। তাঁর হিসাবমতে পৃথিবীর দুই মেরুর প্রান্ত লম্বাটে নয়, বরং চাপা। নিউটনকে সমর্থন করলেন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী খ্রিস্টিয়ান হিউইগেন্‌স। তিনি বললেন পৃথিবী যখন তার অক্ষদণ্ডের চারপাশে ঘোরে তখন তাকে চাপা হতেই হবে। এর সমর্থনে তিনি দেখালেন নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি: একটা কাঠির ডগায় বড় এক তাল কাঁচা মাটি বসিয়ে অক্ষদণ্ডের ওপরে সেটাকে জোরে ঘোরাতে লাগলেন। নরম মাটির ডেলা খানিকটা চেপ্‌টে গিয়ে গোলক থেকে যে আকারে পরিণত হল তা অনেকটা আপেলের মতো দেখতে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠল। ফরাসীরা জোর দিয়ে বলে চললেন, 'পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্ত লম্বাটে!' 'চেপ্‌টা, চেপ্‌টা...' এর জবাবে বললেন ইংরেজরা। এই বাদানুবাদ মীমাংসার জন্য পাঠাতে হল নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক অভিযান, পরিমাপ করে দেখতে হল মধ্যরেখাগুলি। নতুন নতুন গবেষণাকর্মের ফলে কালে প্রমাণিত হল যে পৃথিবী বাস্তবিকই উত্তর-দক্ষিণে খানিকটা চেপ্‌টা, যদিও ঠিক সমানভাবে নয়।

পৃথিবীর আকার যে ঠিক কী রকম তা চূড়ান্তভাবে

নির্ধারিত হল আমাদের এই কালে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হল পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাকাশের ব্যবহারিক চর্চার কাল শুরু হল।

প্রথম পরীক্ষার পর একের পর এক যাত্রা করতে লাগল সোভিয়েত বাহক-রকেট। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের বাহক ইউনিটগুলিতে বন্যাস্রোতের মতো তথ্য আসতে শুরু করল।

এক বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কক্ষপথে পাঠাল তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ।

সমান উপবৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির এই যাত্রা পর্যবেক্ষণ করার পরই বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে উত্তর গোলার্ধের ওপর দিয়ে যাবার সময় মহাকাশযানগুলি তাদের কক্ষপথ নীচু করে যেন 'ডুব দেয়'। মনে হয় এখানে কোন একটা কিছু তাদের আকর্ষণ করে, অথচ দক্ষিণ গোলার্ধের ওপর দিয়ে যাত্রার সময় কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কী হতে পারে?

কম্পিউটার যন্ত্র হিসাবের কাজে লেগে গেল, ইতিমধ্যে দুই মহাদেশ থেকে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল কৃত্রিম উপগ্রহ, তথ্যাদি জমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উত্তর পাওয়া গেল! পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে — ভারত মহাসাগর অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগের অদূরে কৃত্রিম উপগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণ স্ফীতি দেখতে পেল। অনেক মাপজোখের পর দেখা গেল আমাদের গ্রহ উত্তর গোলার্ধে সামান্য লম্বাটে আর দক্ষিণ গোলার্ধে খানিকটা চাপা — অনেকটা নাশপাতির মতো তার আকার। তবে বইতে যেমন আঁকা হয়ে থাকে সে রকম মসৃণ, সুন্দর আর মোলায়েম নয়, এবড়োখেবড়ো, ক্ষতবিক্ষত তার গা।

কিন্তু পৃথিবীকে নাশপাতির আকারের আখ্যা দিয়েও ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাহলে কী উপায়? এই কারণে বিজ্ঞানীরা সকলে মিলে বেছে নিলেন একটি পরিভাষা — 'geoid' — ধরাকৃতি। শব্দটির উদ্ভব অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে! এই আখ্যা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটির কোন কারণ থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে পৃথিবীর আরও যথাযথ যে ছবিই পাওয়া যাক না কেন, ধরাকৃতি — এই সংজ্ঞার মধ্যে তার সবগুলিই দিব্যি কুলিয়ে যেতে পারে।

উপসংহার
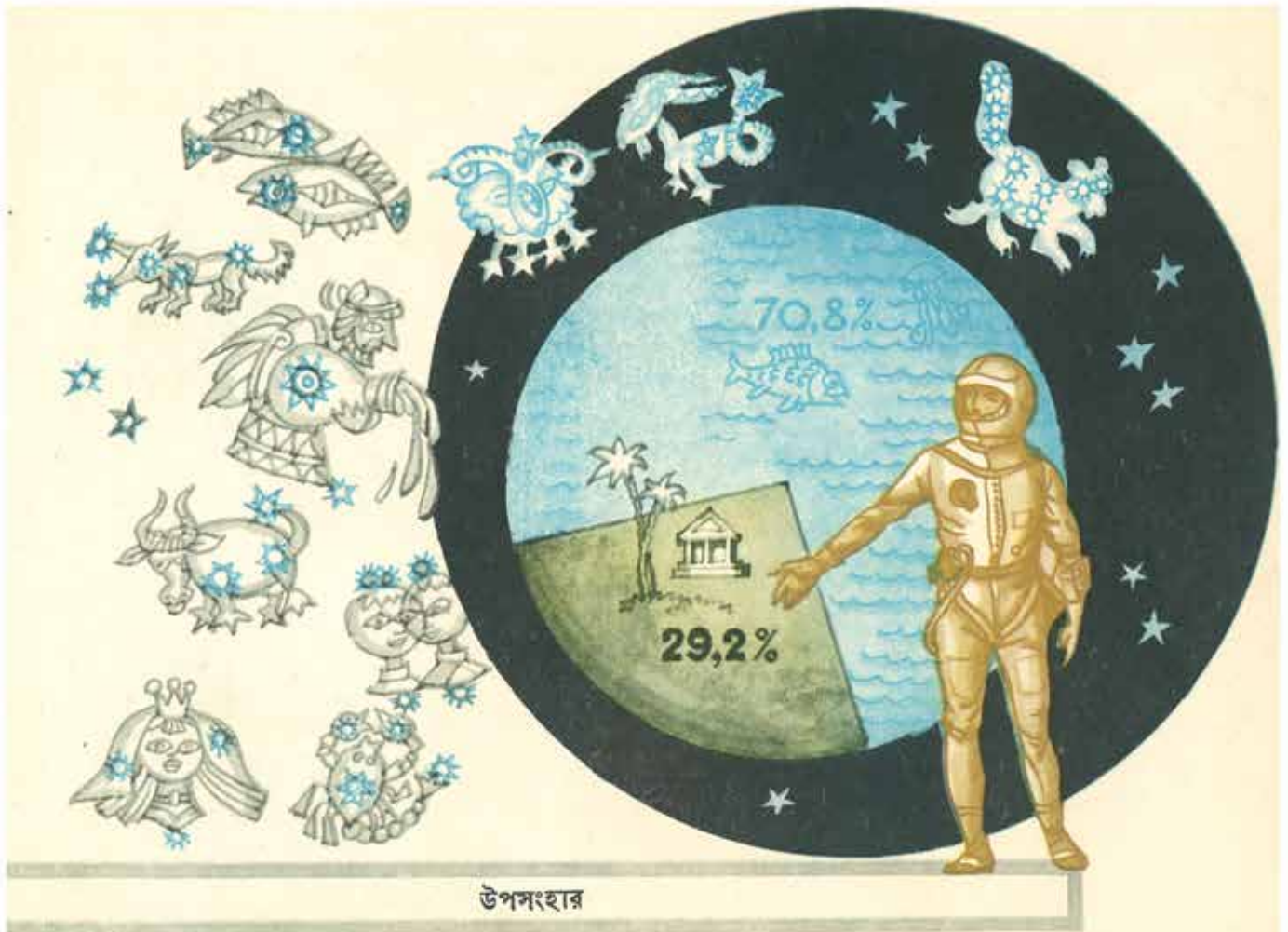
পৃথিবীর মেরুবৃত্তের ব্যাসার্ধ ৬৩,৫৬,৭৮০ মিটার, কিন্তু নিরক্ষবৃত্তের ব্যাসার্ধ ২১.৩৮০ মিটার দীর্ঘতর। একুশ কিলোমিটারের সামান্য বেশি এই বাড়তি অংশটুকু আমাদের ভূমণ্ডলের মতো একটি গোলকের ব্যাসার্ধের পক্ষে অবশ্যই সামান্য। কিন্তু তার ফলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য ৪,০০,৭৫,১৬০ মিটার পৃথিবীর মধ্যরেখার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ১,৩৪,৩৩৪ মিটার বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর একশ চৌত্রিশ কিলোমিটার — যাই বল না কেন খুব একটা কম দূরত্ব নয়।

আজ আমাদের গ্রহের আকার ও আয়তন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের আমরা যথাযথ উত্তর দিতে পারি। 'পৃথিবীতে জলভাগ না স্থলভাগ কোন্‌টা বেশি?' প্রাচীন ভৌগোলিকদের এই বাদ-প্রতিবাদেরও আমরা উত্তর দিতে পারি। যারা যথাযথ পরিসংখ্যান চায় তাদের জন্য বলতে পারি: পৃথিবীতে সাগর-মহাসাগর আছে ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের। এই আয়তন সমগ্র ভূপৃষ্ঠের ৭০·৮ শতাংশ। তার মানে স্থলভাগ দাঁড়াচ্ছে মোটে ২৯:২ শতাংশ।

এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির বাস। তাই এখন মানুষের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের পৃথিবীর কল্যাণ, আর এই কারণেই তোমার আমার কাজ হল পৃথিবীকে রক্ষা করা, পৃথিবীর সুখ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা।

পৃথিবীর আকার সন্ধান ও নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষকে যে কত দীর্ঘ পথযাত্রা করতে হয়েছে তা এখন তোমরা দেখলে ত!

সূচি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্‌স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন
'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

Tomilin A.

HOW PEOPLE DISCOVERED
THE SHAPE OF THE EARTH

In Bengali

А. Томилин

КАК ЛЮДИ ИСКАЛИ ФОРМУ СВОЕЙ ЗЕМЛИ

На языке бенгали

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000734-8

প্রাচীনকালে বিভিন্নজাতির মধ্যে আমাদের পৃথিবীর গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে কেমন ধারণা ছিল এই মানচিত্রটি থেকে তা বোঝা যাবে